Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13
বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

বিশ্ব মহামারি রুখতে
চাই সকল নাগরিকের বিনামূল্যে টিকাকরণ

সমীক্ষণ

একাদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ১❖জানুয়ারি ২০২১

বিশেষ রচনা ঃ

চলমান কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

অতিথি কলম
করোনাভাইরাস - ২০১৯

ধারাবাহিক নিবন্ধ
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব
টিকা আবিষ্কারের পথিকৃৎ এডওয়ার্ড জেনার

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর
জিনোম এডিটিং – সমস্যা ও সম্ভাবনা

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ **সম্পাদকীয় ঃ** ২

◈ **চিঠিপত্র ঃ** ৫

◈ **চয়ন ঃ** ৬
লোকসেবা – আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

◈ **বিশেষ রচনা ঃ** ৭
চলমান কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

◈ **অতিথি কলম ঃ** ১০
করোনাভাইরাস-২০১৯ – নিতাই চন্দ্র মন্ডল

◈ **স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ** ১৭
মানবজাতির টিকা আবিষ্কারের পথিকৃৎ এডওয়ার্ড জেনার
ব্যতিক্রমী এক পথ প্রদর্শক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

◈ **ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ** ২২
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ **করোনা বিশ্বমহামারীর দিনলিপি ঃ** ২৬

◈ **বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ** ২৯
২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার
জিনোম এডিটিং – সমস্যা ও সম্ভাবনা
সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের খাদ্যতালিকা

◈ **বিজ্ঞানের খবর ঃ** ৩৩

◈ **রিপোর্ট ঃ** ৩৬
এনএইচএম কর্মীদের আন্দোলনের সমর্থনে বিজ্ঞান মনস্ক

◈ **সমাজ দর্পণ ঃ** ৩৭
পুঁজিবাদের স্বার্থে 'হারাম' 'হালাল' হয়ে যায়

◈ **সংগঠন সংবাদ ঃ** ৩৮
করোনা আতঙ্ক দূর করতে জনসচেতনামূলক কর্মসূচী
মনরেগা প্রকল্পে ... শ্রমিকরা মাটি চাপা পড়লেন
মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মসূচী

সম্পাদকীয় ঃ

বিশ্ব মহামারি রুখতে চাই সকল নাগরিকের বিনামূল্যে টিকাকরণ

কোভিড-১৯ এর কবলে সারা বিশ্ব। সারা বিশ্বে এর প্রকোপ দেখা গেলেও মৃত মানুষের সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। যেমন ভারতে সংক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নগামী হলেও ইউরোপ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা এখনো ভয়াবহ রূপে বিদ্যমান। শোনা যাচ্ছে ইউরোপে আটটি দেশে নতুন স্ট্রেইন পাওয়া গেছে সার্স কোভ-২ এর। এদের সংক্রমণ ক্ষমতার ভয়াবহতা ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে চর্চার বিষয়। এমতাবস্থায় কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনের সর্বজনীন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ভ্যাকসিন প্রয়োগের বিরুদ্ধে চাপা এবং প্রকাশ্য প্রচার চলছে। সংবাদে প্রকাশ, এর প্রধান উদ্যোক্তারা মূলত ইউরোপের দক্ষিণপন্থী নয়ানাৎসী শক্তিরা। আমাদের দেশেও উগ্রধর্মবাদীদের মধ্যে ভ্যাকসিন সম্পর্কে বিরোধী প্রচার আছে। এছাড়া লাগাম ছাড়া কাল্পনিক ধারণাও আছে ভ্যাকসিন সম্পর্কে। অনেকে বলেন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এইচআইভি-র মতো মারাত্মক জীবাণু সংক্রমণ ছড়ানো হতে পারে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে মাইক্রোচিপ দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় গোপনে। তবে আজগুবি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও এমন ধারণার উৎস বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন অমানবিক অনৈতিক কাজকর্ম। মানুষ মারা পারমাণবিক-রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রের প্রয়োগের ইতিহাস এই ধারণাকে পুষ্ট করে। বিশ্বের নাগরিকদের উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে যেভাবে সমস্ত তথ্য বিশ্বপুঁজিবাদ সংগ্রহ করছে, তাই দেখে অনেক নাগরিক এমন সব ধারণাকে বিশ্বাস করেন।

ভ্যাকসিন বিরোধী প্রচারের আরেকটি কারণ এতে শুকরের দেহ থেকে সংগৃহীত জিলেটিনের ব্যবহার। স্মরণ করুন, অনেকদিন আগে শুকর ও গরুর চর্বি দিয়ে কার্তুজ তৈরি নিয়ে 'প্রচার' ভারতের শুকনো শস্য ক্ষেত্রে দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তখন ভারতে বৃটিশ কোম্পানির শাসন চলছে। তখনকার সামাজিক চেতনা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের কারণে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত প্রসারের ফলে, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে পাল্টে গেছে। অন্যদিকে সমস্ত কিছুর মত

ভ্যাকসিনও বিশ্বের বড় বড় ফার্মা কোম্পানিগুলির কাছে লাভজনক পণ্য। তাদের প্রবল চাপে নতি স্বীকার করে কট্টর মৌলবাদের প্রচারকদেরও প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে শুকরের দেহ থেকে সংগৃহীত জিলেটিন 'হারাম' নয় 'হালাল'। কারণ তা খাদ্য দ্রব্য হিসেবে নয় ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভ্যাকসিন রোগ নিরাময়ের ওষধি নয়। কারণ ওষুধ প্রয়োগ করা হয় অসুস্থ দেহে। সার্স কোভ-২ এর বিপরীতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হয় সংক্রমিত নন এমন মানব দেহে। মানবদেহে এই অসুখের জীবাণু ভাইরাসটিকেই বা তারই অংশবিশেষ প্রবেশ করিয়ে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলার কাজই করে ভ্যাকসিন। এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত লিখিত ইতিহাসে পাওয়া তথ্য অনুসারে এই প্রচেষ্টা শুরু হয় চিন দেশে। অনেক পরে ইউরোপে, বিশেষ করে ইংলন্ডে এর প্রচলন করেন লেডি মেরি ওরটলে মন্টেগু ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন এই প্রক্রিয়াকে বলা হত ইনোকুলেশন। মানব দেহে নির্দিষ্ট অসুখেরই জীবাণুর পরিবর্তে একই পরিবারভুক্ত অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক জীবাণুকে ব্যবহার করে ইনোকুলেশন করে সারা বিশ্বকে নতুন দিশা দেন এডওয়ার্ড জেনার নামক এক চিকিৎসক। তিনি স্মলপক্সের প্রতিরোধে গোবসন্তের জীবাণু ব্যবহার করেন। ল্যাটিন ভাষায় গরুর অর্থ ভ্যাক্কা হওয়ায় আবিস্কৃত টিকার নাম হল ভ্যাকসিন। ইতিহাস দেখায় যে পরিবর্তীকালে স্মলপক্সের ভ্যাকসিন স্মলপক্সেরই দেহাংশ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। যদিও টিকার প্রতিশব্দ ভ্যাকসিন সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করে।

যে অসুখ থেকে নিস্কৃতির জন্য এই টিকাকরণ, সেই অসুখেই সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত। তাই হয় জীবাণুটি নিষ্ক্রিয় করে (তার মানব দেহ কোষে ঢুকে প্রতিলিপি গঠনের কাজকে ব্যহত করে) বা তার প্রয়োজনীয় দেহাংশকে (যা কিনা দেহে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে না বলে ধারণা) দেহকোষে প্রবেশ করিয়ে আমাদের প্রতিরোধতন্ত্রকে জাগিয়ে তোলাই ভ্যাকসিনের কাজ।

ভ্যাকসিন তৈরির এই নিয়ম থেকেই আন্দাজ করা যায় যে এ কাজ করতে হয় অনেক সাবধানে। প্রথমে উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় একক কোষে, তারপর অন্য কোনো প্রাণী দেহে। এই প্রক্রিয়াকে বলে প্রিক্লিনিকাল ট্রায়াল। প্রথম ধাপের ক্লিনিকাল ট্রায়ালে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে দিয়ে শুরু করে দ্বিতীয় ধাপে শতাধিক, তৃতীয় ধাপে সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবীর শরীরে সেই ভ্যাকসিনেশন করা হয়। তারপর প্রাপ্ত নিরাপদ ভ্যাকসিনকে সর্বসাধারণে প্রয়োগ করাই নিয়ম। ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সময় স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে গোপন রাখা হয় তার দেহে প্রবেশকারী বস্তুটির সম্পর্কে। স্বেচ্ছাসেবীদের এক অংশকে নির্ধারিত ভ্যাকসিনটাই দেওয়া হয়। অপর অংশকে যা দেওয়া হয়, তা হল নিষ্ক্রিয় বস্তু। এমন অবস্থায় কার্যকরী ও অকার্যকরী ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া যাচাই করে, এককথায় ট্রায়ালের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সব থেকে নিরাপদ ও কার্যকরী ভ্যাকসিনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বিজ্ঞান মনস্কতার অভাবে এমন অনেক খবর ইলেক্ট্রনিক-সামাজিক মাধ্যমে ছড়াচ্ছে যে নির্দিষ্ট কোনো পরিচিত ব্যক্তির সংক্রমণের খবর, যিনি পূর্বে ভ্যাকসিন ট্রায়ালে স্বেচ্ছাসেবী হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর দেহে ভ্যাকসিনের পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় বস্তু দেওয়া হয়েছে কিনা তা প্রস্তুতকারক সংস্থার বিজ্ঞানীরা ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। এটাই ভ্যাকসিন ট্রায়ালের সর্বজনগৃহীত নীতি।

বিশেষজ্ঞদের সকলেই একমত যে এ বিষয়ে কোনোরকম তাড়াহুড়ো চলবে না। কিন্তু মহামারি কবলিত বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা এমনই বিপর্যয়ের সম্মুখীন যে তাদের যত দ্রুতসম্ভব ভ্যাকসিন প্রয়োজন। পাশাপাশি এটা একটা লাভজনক পণ্যও বটে। এই পণ্যের বাজার আবার বিশাল।

এমনই তাড়াহুড়ো, বিশ্বের প্রায় সবকটি ভ্যাকসিন উৎপাদক দেশের মত ভারতেও দেখা গেছিল। ভারত সরকার ১৫ই অগাস্টের মধ্যে ভ্যাকসিন নিয়ে আসার জন্য বিজ্ঞানীদের চাপ সৃষ্টি করেছিল। রাশিয়ার স্পুটনিক ভি তৃতীয় ধাপের ক্লিনিকাল ট্রায়াল ছাড়াই সর্বজনে প্রয়োগের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই ভ্যাকসিনই ভারতের ওষুধ কোম্পানি ডঃ রেড্ডিজ ৩০ কোটি উৎপাদন করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। যারা টাকা ঢেলেছে, তারা আগে থেকে বুকিং করেছে ভ্যাকসিনের। পাশাপাশি পুঁজি বিনিয়োগ চলছে গবেষণাজাত ভ্যাকসিন বেচে মুনাফা কামানোর জন্যও। চিনা সরকার যেমন নিজস্ব উদ্যোগে চারটি ভ্যাকসিন গবেষণাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তেমনই চিনা বাওটেকনোলজি কোম্পানি ফুসুন ফার্মা আবার জার্মানি ভিত্তিক বাওটেক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ফাইজারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা চালাচ্ছে। এই ভ্যাকসিন আবার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি আগাম বুকিং করেছিল।

বিশ্বমহামারি মোকাবিলায় বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র পারস্পরিক

বিরোধকে পাশে সরিয়ে রেখে একত্রে গবেষণা করে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন ও তা সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলামেনে সর্বজনীন প্রয়োগের চাহিদা থাকলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সার্স কোভ-২ এর ভ্যাকসিন গবেষণার শুরুতে এমন বিশ্বমহামারি মোকাবিলায় গবেষণা ও প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গড়ে ওঠেনি। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ভ্যাকসিন গবেষণা ও মহামারি মোকাবিলার জন্য সুইজারল্যান্ডের দাভোসে মূলত নরওয়ে ও ভারতের উদ্যোগে গড়ে ওঠে সিইপিআই নামক একটি গ্লোবাল পার্টনারশিপ কাঠামো। এতে প্রাইভেট সংস্থা হিসেবে যুক্ত আছে বিল গেটস্ ও মিলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন, দ্য ওয়েলকাম ট্রাস্ট। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে আরো একটি বিশ্ব ভ্যাকসিন জোট জন্ম নেয়। তার নাম জিএভিআই (গাভি)। এর অন্যতম পার্টনার এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু), ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিল-মিলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশন। মহামারির প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন হু-এর উদ্যোগে কোভিড চিকিৎসা নিয়ে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের শুরু হয়। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র হু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয। চিনও দীর্ঘসময় পর্যন্ত হু-এর তৈরি 'কোভ্যাক্স' উদ্যোগে নিজেকে জড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এসেছে। 'কোভ্যাক্স' উদ্যোগে যোগ দিতে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বিনিয়োগ ও উদ্যোগ নিয়েছে। হু-এর উদ্যোগ 'কোভ্যাক্স'-এ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধনী দেশগুলি যোগ দেয়নি বললেই চলে। ৬ই অক্টোবর হু সংবাদ মাধ্যমে জানায় যে 'কোভ্যাক্স'-এ অংশগ্রহণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কথা চলছে। ভারত ও চিন কোভ্যাক্সের সঙ্গে যুক্ত না থাকাকালেও জিএভিআই (গাভি)-র সাথে যুক্ত ছিলই। যবে থেকে কোভ্যাক্সের কো-লিডার হিসেবে গাভি সংযুক্ত হয়েছে। তবে থেকে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর ধনী-গরীব নির্বিশেষে ১৭০টি দেশ 'কোভ্যাক্স' পরিকল্পনার অধীন চলে এসেছে। মুখে 'হু' জানিয়েছে ২০২১-এর শেষে ২ বিলিয়ন [১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি] ভ্যাকসিন, সদস্য দেশগুলিকে দেওয়া হবে সদস্য দেশগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে সমানভাবে। যদিও দৈনিক সংবাদপত্র 'দ্য হিন্দু' বলেছে এটা পরিষ্কার নয় যে কী শর্তে চিন 'কোভ্যাক্স'-এ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ সদস্যরাষ্ট্রগুলির অধিকারের সমতা মানা হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যারা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী ও বন্টনের অধিকারী, তাদের স্বার্থ এর সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই কড়ি না ফেললে তেল পাওয়া যাবে না। অক্সফোর্ডের সাথে গবেষণারত ভারতের সিরাম ইন্সটিটিউটের কর্ণধার আদর পুনাওয়ালা টুইটারে প্রশ্ন তুলেছেন যে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার মতো রসদ ৮০ হাজার কোটি টাকা আছে তো?

সংবাদে প্রকাশ, আগামী বছর জুলাই মাসের মধ্যে গোটা দেশে ৩০ কোটি জনের ভ্যাকসিন পৌঁছে দেবার আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর একমাত্র কারণ – টিকার জন্য জোগানের ঘাটতি। বলা হয়েছে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে অগ্রাধিকার ক্রমে।

বিজ্ঞানীদের অভিমত বরাবরই ছিল বিশ্বের সকল নাগরিকের ভ্যাকসিনেশন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। এমন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান মনস্কের দাবি –

*** সকল নাগরিককে বিনামূল্যে টিকাকরণ করতে হবে।**

*** কোভিড যোদ্ধাদের দিয়ে শুরু করে বয়স্ক, শিশু এবং কোমর্বিডিটি আছে এমন মানুষদের সবার আগে টিকাকরণ করতে হবে।**

*** কোভিড যোদ্ধা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চল থেকে টিকাকরণ চালু করতে হবে।**

*** টিকা বা ভ্যাকসিনের পক্ষে রাষ্ট্রকে গণমাধ্যম ব্যবহার করে তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে জনতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।■**

চিঠিপত্র ঃ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

'সমীক্ষণ'-এর কয়েকটা সংখ্যা পড়লাম – উপর উপর। বেশ তথ্যসমৃদ্ধ লেখা এবং সময়োপযোগী।

অবাক হলাম – বিনিময় মূল্য মাত্র ১০ টাকায় এখনও এ পত্রিকা নিয়মিত বার হচ্ছে। এবং সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে!

আমরা 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকা বার করতেই হিমসিম খাচ্ছি – যেখানে সম্পাদকমন্ডলীতে বেশি কিছু ভালো মাথা থাকা সত্ত্বেও। এবং যেখানে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা কম নয়।

আপনাকে আমার অসীম শ্রদ্ধা জানাই।

– ডাঃ অনুপ সাধু
(মেডিকেল কলেজ, কলকাতা)
২২.৯.২০২০

চিঠিপত্র ঃ

সম্পাদক, সমীক্ষণ পত্রিকা

সাথী,

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে কয়টা বিজ্ঞান পত্রিকা ত্রিপুরায় পেয়ে থাকি তার মধ্যে বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক পত্রিকা সমীক্ষণ নিঃসন্দেহে অন্যতম। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি হাতিয়ার হিসেবে আপনারা যেভাবে পত্রিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে এই করোনাকালের মধ্যেও আপনারা আগস্ট সংখ্যা প্রকাশ করেছেন এবং নিশ্চয়ই পরবর্তী সংখ্যারও প্রস্তুতি চলছে। একজন অতি সাধারণ পাঠক হিসেবে পত্রিকার আগস্ট সংখ্যার কয়েকটি বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত মতামত দিতে চাই। বক্তব্য গ্রহণযোগ্য মনে হলে বিচার করবেন, ভুল থাকলে মার্জনা করবেন।

সাথী, উক্ত সংখ্যার সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত "মহামারী প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জাতীয়করণ" প্রবন্ধটি বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু পুরো রচনাটির মধ্যে এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায়নি। এক, চতুর্থ পৃষ্ঠায় স্পেন ও আয়ারল্যান্ডে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পূর্ণ জাতীয়করণের কথা লেখা হয়েছে, আর শেষে দাবির জায়গায় এক লাইন। সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্য যেহেতু একটি সামাজিক বিষয়, তাই ব্যক্তি মালিকানাধীন চিকিৎসা ব্যবস্থা (যেখানে রোগী রুপি খদ্দেরের ক্রয় ক্ষমতাই নির্ধারক) এই সমস্যা সমাধান করতে পারে না। এই জন্যই সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের দায়িত্বে প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার গ্যারান্টি প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের জাতীয়করণ করার এই দাবীর যৌক্তিকতাকে এইভাবে ব্যাখ্যামূলক ভঙ্গীতে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল যা এই রচনায় একেবারেই করা হয়নি বলেই মনে হয়েছে। তাই শিরোনামের সাথে মূল রচনা সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছে।

সপ্তম পৃষ্ঠায় পত্রিকার পাঠক জনৈক রোহিত প্রামাণিকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকের সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সমীক্ষণের বিভিন্ন লেখালেখি গুলিকে সামাজিক বিষয় ও মূল বিজ্ঞানের বিষয় বলে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পাঠক সামাজিক বিষয়গুলিকে বিজ্ঞানের বিষয় বলে মনে করেন না তা বুঝা যায়। এই চিঠির উত্তরে সম্পাদকের তরফে যা বলা হয়েছে তাতেও এই বিষয়কে স্পষ্ট করা হয়নি যে এই ধরনের বিষয়গুলি সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়, তাই পত্রিকায় স্থান দেওয়া হয়। বরং এইভাবেই জবাব লেখা হয়েছে যে বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলের জীবনী, 'লাল গ্রহে অভিযান ও অ্যালিসা কার্জন' এর পাশাপাশি জীবনের জলছবি, সমাজ দর্পণ ইত্যাদি সামাজিক বিষয়কে তুলে ধরা হয়। যদিও বলা হয়েছে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে মানুষের পিছিয়ে পড়ে থাকার বৈপরীত্ব তুলে ধরার জন্য এই সামাজিক বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে এবং সামাজিক বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস রাখা হয়েছে। কিন্তু এতেও মূল কথাটা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি যে এই বিষয়গুলো খোদ সমাজ বিজ্ঞানেরই বিষয়।

বিশেষ রচনার বিভাগে 'কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া বিক্ষোভের দাবানল' প্রবন্ধে ২৩ নং পৃষ্ঠায় মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে যেখানে প্রবন্ধের প্রধান বিবেচ্য বিষয়কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এই বলে – "... বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করলে প্রতি ক্ষেত্রে দেখবো এই বিভাজন টিকে থাকে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে জনগণকে শোষণ করার মধ্য দিয়ে। সাম্প্রতিকতম বর্ণ বিদ্বেষের ঘটনাকে তাই এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোকে পর্যালোচনা করা দরকার।" অথচ এই লেখায় এমন সব বিষয় সিংহ ভাগ জায়গা দখল করে নিয়েছে যা আদৌও এখানে প্রয়োজনেই ছিল না। যথা, গায়ের রং এর জন্য দায়ী মেলানিন – ম্যালানোসাইট কোষে তার অবস্থান – দু লক্ষ বছর আগে মিশকালো দেহের বর্ণ – অতিবেগুনী রশ্মির ভূমিকা – ন্যানোমিটার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য – ইউভিআর মাপার যন্ত্র – ইউভিআই কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল – এই সমস্ত অতীব টেকনিকেল/ একাডেমিক্যাল বিষয়গুলোর সবিস্তারে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল না এই লেখায়, কেননা চামড়ার রং এর সাথে মানুষের গুনাগুণের যে কোনো সম্পর্ক নেই সে কথা আজ তর্কাতীত। এর ফলে যেখানে বিষয় ছিল কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং শাসক শ্রেণীর বিভেদের রাজনীতি, সেখানে এই লেখা তার মূল ফোকাস অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।

সব শেষে বলতে চাই, পত্রিকার দাম ২০ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা রাখলেই সংগ্রহ করতে সুবিধে হয় (দুটি সংখ্যা একত্রে করে পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু বাড়ালেও)। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই এই পত্রিকার অনেক পাঠক আছে যারা ছাত্র কিংবা বেকার যুবক। এধরনের পত্রিকার পুরো খরচ বিক্রি থেকে নাও উঠে আসতে পারে। সর্বাধিক পাঠকের কাছে পত্রিকা পৌঁছুতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করি।

ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'সমীক্ষণ' তথা 'বিজ্ঞান মনস্ক' সংগঠনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের যে পথে সংগঠন এগিয়ে চলেছে তার লক্ষ্য একদিন পূরণ হবেই। এই আশা রেখে চিঠি শেষ করলাম।■

অভিনন্দন সহ
নিখিল দেববর্মা
ধলাই ত্রিপুরা

চয়ন ঃ

লোকসেবা

– আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

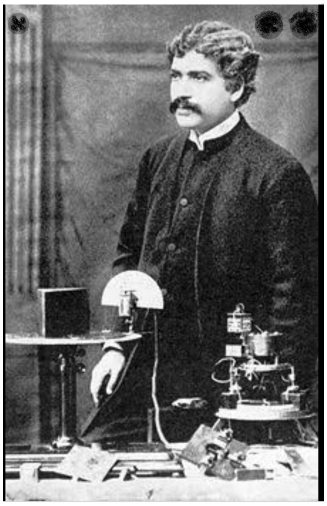

গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেসড্ মিশনে' ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বন্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা-হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুহূর্ষ স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বন্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। যেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম তাহার মজ্জায় চির বেদনা নিহিত আছে।■

চিঠিপত্র ঃ

সম্পাদক, সমীক্ষণ

আমি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। বিগত দু'টি সংখ্যা সম্পর্কে আমার মতামত নিম্নরূপ ঃ–

"পৃথিবীর কোন মানুষই ... মানবজাতি অভিবাসী" রচনাটি অভিনন্দন যোগ্য। এটি এনআরসি বিষয়টা বুঝতে এবং প্রশ্নে ঐতিহাসিক ধারণা উপলব্ধিতে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

রক্তদান সম্পর্কে গত সংখ্যার রচনাটি পড়ে অনেক ভুল ধারণার অবসান হয়েছে। 'বয়েলিং ফ্রগ সিনড্রোম' রচনাটি চমৎকার তবে রচনাটিতে সম্ভবত কথাটি না থাকলে আরও স্পষ্ট হত।

"করোনা দেবী জন্ম" রচনাটি সময়োপযোগী ও শিক্ষণীয়।

সবশেষে বলতে চাই ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে বিজ্ঞান মনস্ক যেভাবে ভূমিকা পালন করে তা খুবই ইতিবাচক।

আমার প্রস্তাব হল বিজ্ঞান মনস্ক সর্বভারতীয় স্তরে সংগঠন গড়ে তুলুক এবং তার হিন্দি ও ইংরাজি মুখপাত্র নিয়মিত প্রকাশিত হোক।

ধন্যবাদান্তে

বাবলু ঠাকুর, কলকাতা

বিশেষ রচনা ঃ

চলমান কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

গত ২৬শে নভেম্বর থেকে ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এবং আরও কয়েকটি রাজ্যের ফার্মাররা সংসদে গত সেপ্টেম্বর ২০২০ তে পাশ হওয়া তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ বাতিলের দাবিতে এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের ফসল কেনাকে আইনসিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলনে। তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে ফার্মারদের অনমনীয় লড়াই এখন দেশের প্রধান খবর।

যে আইনগুলি বাতিলের দাবিতে মুখ্যত এই আন্দোলন তার প্রথমটিতে যা বলা হয়েছে তার মূল বিষয়বস্তু হল বিদ্যমান রাজ্য সরকার দ্বারা আইনসিদ্ধ কৃষিপণ্যের বাজার বা রাজ্য সরকারের অধীন কৃষিমন্ডিগুলির বাইরেও ফার্মাররা বা কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীরা মাল কেনা-বেচা করতে পারবে। এই কেনা-বেচা হবে সম্পূর্ণ কর-সেস-লেভিমুক্ত। ফার্মাররা মূলত এই আইনটি বাতিল করার পক্ষে, কারণ তাঁদের আশঙ্কা এর ফলে এপিএমসি (এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেট কমিটি) বা কৃষিমন্ডিগুলি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলি কৃষিপণ্যের বাজার দখল করবে এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকার দ্বারা কৃষিপণ্য ক্রয়ের বিষয়টি ভবিষ্যতে আর থাকবে না।

দ্বিতীয় আইনের মূল বিষয় হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে চাঙ্গা করার ভিত্তি হিসাবে চুক্তিচাষ বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর সক্রিয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রণয়ন করেছে।

তৃতীয় আইনটি পুরানো আইনের সংশোধনী। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কালোবাজারি, মজুতদারি রুখতে যে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন চালু হয়েছিল সংশোধিত আইনে সেই বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হল। বৃহৎ কোম্পানিগুলিকে হিমঘর, গুদাম তৈরির অনুমতি দেওয়া হল। চাল-গম-ডাল-তৈলবীজ-আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির মজুতের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ায় কৃষিপণ্যের বাজারে বৃহৎ কোম্পানিগুলির নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়বে এবং মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ আরও বাড়বে।

২০২০-র বিদ্যুৎ বিলের প্রস্তাব অনুসারে কৃষি উৎপাদনে বিদ্যুতের ভর্তুকি প্রত্যাহারে কৃষি উৎপাদনে খরচ বাড়বে। তাই আন্দোলনে এই আইন বাতিলের দাবি উঠেছে। আন্দোলনের চাপে সরকার এই দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছে।

এই চলমান কৃষি আন্দোলনকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিচার করতে গেলে শুধুমাত্র বর্তমান স্থিতিকে বিচার করলে সঠিক ধারণায় পৌঁছানো যাবে না। ভারতে কৃষি ব্যবস্থার বিবর্তন, কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক বর্গগুলির বিবর্তন, কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলাফল, বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পারস্পরিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব, অবস্থান বিবেচনা করলে তবেই বর্তমান কৃষি আইন ও তার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের চরিত্র এবং আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে সঠিক মন্তব্য করা সম্ভব। কৃষি ও কৃষকদের সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত দিশা নির্ণয় সম্ভব।

ভারতে ইউরোপের মত মধ্যযুগীয় ভূমিদাস ভিত্তিক সামন্ত কৃষি ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন এশিয়াটিক ধরনের গ্রাম সমাজে সামন্ত ব্যবস্থা জারি থাকলেও প্রথম থেকেই জমির মালিক ছিল রাষ্ট্র। এদেশে ইউরোপীয়দের আগমণের প্রাক্কালেই সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন, হস্তশিল্পের প্রচলন পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনা করে। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় সে যুগে ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে এসে এদেশ থেকে উন্নত শিল্পজাত ও কৃষিজ পণ্য ইউরোপে রপ্তানিই করত। পরবর্তীতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানির মাধ্যমেই ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হয়। যাই হোক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এদেশে কৃষি ও শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিল প্রাথমিকভাবে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনেই বিদ্যমান সামন্ত ভূমিসম্পর্ক টিকিয়ে রেখে সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে এদেশে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। অর্থকরী ফসল চা, পাট, তুলা, রাবার ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি এই বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে চলে। কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনীকরণ শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশে প্রথম ট্রাক্টর পৌঁছায়। ঔপনিবেশিক শাসকরা সামন্ত ভূমিসম্পর্ক অটুট রেখে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কয়েকটি পকেটে এই বিকাশ ঘটিয়েছিল এদেশের স্পিনিং মিল, কটন মিল, জুট মিল, চিনি কল ইত্যাদি কৃষিজ পণ্য ভিত্তিক শিল্পের স্বার্থে। এর পাশাপাশি নীল, রেশম কীট, তামাক, পশুপালন (চামড়ার প্রয়োজনে) হতে থাকে শিল্পের প্রয়োজনে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের পুঁজিপতিরা (যাদের জন্ম হয়েছিল কমিশন এজেন্টরূপে) বস্তুত ব্রিটেনের বন্ধন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে না চেয়ে তাদের হাত ধরেই এদেশে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাজারে ঢোকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তৈলবীজ, ধান, গম, আখ, কাপার্স, পশম, রেশমকীট, পাট,

পশুপালন, চা, কফি, তামাক, রবার, মসলা উৎপাদন করিয়ে রপ্তানি করা শুরু করে। এর ফলে পুরানো কৃষি উৎপাদনের মধ্যে বাজারের লক্ষ্যে উৎপাদন, নানা প্ল্যানটেশন গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরও এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে না গিয়ে সেই ব্যবস্থার অধীনে থেকেই দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ ঘটিয়েছে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পয়েন্ট৪ পরিকল্পনা অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে সার, বীজ, কীটনাশক, যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করার মধ্য দিয়ে কৃষির বুর্জোয়াকরণ আরও জোরে সোরে শুরু হয়। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষে পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলের উর্বর জমিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন এবং উৎপাদিকা শক্তির বিপুল বৃদ্ধি ঘটে, যাকে সবুজ বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। এরপর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির রূপায়ণ হয়ে চলেছে। এরফলে দেখা যায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দেশের সব ধরনের খাদ্যশস্য যেখানে সর্বমোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন উৎপন্ন হত ২০১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন। প্রতি হেক্টর জমিতে এই ৬৭-৬৮ বছরে খাদ্য শস্য উৎপাদন ১৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিতে উৎপন্ন এবং উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির ফলাফল কী ঘটেছে? কৃষক সমাজের মধ্যে জন্ম হয়েছে বৃহৎ (১০ হেক্টর অধিক জমির মালিক) এবং মাঝারি (২ হেক্টর থেকে ১০ হেক্টর জমির মালিক) ফার্মারের। এরা পুঁজি বিনিয়োগ করে, শ্রমশক্তি নিয়োগ করে বাজারের জন্য কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের হিসাবে দেশে মোট চাষযোগ্য জমি প্রায় ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ হেক্টর। এই জমির ৪৩.৩ শতাংশের মালিক হল ৮৬.২ শতাংশ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরা (গড়ে ০.৬ হেক্টর এবং সর্বাধিক ২ হেক্টর জমির মালিক)। দেশের ৪৩.৬ শতাংশ জমির মালিক হল দেশের ১৩.২ শতাংশ মাঝারি ফার্মাররা (২-১০ হেক্টর জমির মালিক) এবং ১৩.১ শতাংশ জমি আছে মাত্র ০.৬ শতাংশ বড় ফার্মারদের (১০ হেক্টরের অধিক) হাতে। এই বৃহৎ ও মাঝারি স্তরের ফার্মাররা জমিতে চাষ করাতে ক্ষেত মজুর নিয়োগ করে। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সর অনুসারে এদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে হয়েছে ১০,৬৭,৭৫,৬৩০জন (জনসংখ্যার ২৬.৫ শতাংশ)।

অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ কৃষির উন্নতি ঘটালেও সাধারণ কৃষকদের বৈষয়িক জীবনে ঘটিয়েছে অবনতি। ভূমিধর কৃষকদের বড় অংশ ভূমিহারা হয়েছেন, সর্বহারায় পরিণত হয়ে চলেছেন। কৃষক সমাজের এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে আগামীতে ১ শতাংশ বুর্জোয়া মালিক এবং বাকি ৯৯ শতাংশ মজুরে পরিণত হবেন। ইতিমধ্যেই শিল্প পণ্যের মত কৃষি পণ্যের এই বিপুল উৎপাদন এক অতি উৎপাদনের সংকট সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়ণের এই যুগে শিল্প পণ্যের মত কৃষিপণ্যও যেহেতু বিশ্ববাজারের অন্তর্গত এবং কৃষি উৎপাদনের সামগ্রী – সার, বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টর, বিদ্যুৎ, ডিজেল পাম্পসহ সমস্ত কিছুই বিশ্বের বড় বড় হাঙর একচেটিয়া কোম্পানির করায়ত্ব তাই বৃহৎ ফার্মার থেকে ক্ষুদ্র কৃষক সর্বস্তরেই ঋণ নিয়ে চাষ করে ফসলের লাভজনক মূল্য না পেয়ে হয় জমি-বাড়ি সর্বস্ব হারাচ্ছেন, নয় আত্মহত্যা করছেন। এই পরিস্থিতিতেই লাভজনক দামে সরকারকে ফসল কেনার দাবি উঠেছে। সার-বীজ-কীটনাশক, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভর্তুকির দাবি উঠেছে, ঋণ মুকুবের দাবি উঠেছে। Indo-US Science & Technology Forumএর ২০০০ খ্রিস্টাব্দের সময়কাল থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত কৃষিক্ষেত্রে আরও সংস্কার, একচেটিয়া কোম্পানির স্বার্থে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা জোরদার করা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিল করে পণ্য মজুতের ঊর্ধসীমা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরই পরিণতি হল ২০২০-র তিনটি নয়া কৃষি আইন।

এই আইন কার্যকর হলে কৃষিপণ্যের বাজার একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আরও কুক্ষিগত হবে, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এদের নিয়ন্ত্রণ বাড়বে এবং কৃষিপণ্য মজুতের ঊর্ধসীমা উঠে যাওয়ায় এই ক্ষেত্রের পুঁজিচক্র বা কার্টেলগুলির পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে কৃষিপণ্যের দামবৃদ্ধির সুযোগ আরও বাড়বে।

সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে পুরানো স্থিতাবস্থা ভেঙে যাওয়া, নতুন অবস্থা সৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়, তা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক। এই যন্ত্রণার মধ্যেই আরও নতুনের সৃষ্টির শর্ত লুকিয়ে থাকে। এখন এই প্রশ্নটি সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করা যাক।

বিজ্ঞান শব্দের এককথায় অর্থ বস্তুর বিকাশের নিয়ম। অর্থাৎ জগতের যে কোন বস্তুর অবস্থা চিরস্থায়ী নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কারণ যখন আবিষ্কার হয় তখন তা হয় বিজ্ঞান। যেমন পতনশালী বস্তুর পতন হয় উপর থেকে তা সকলেই দেখে, কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ বলই যে তার পতনের কারণ সেটা যখন আবিষ্কার হয় তখন তা হয় বিজ্ঞান। মানব সমাজের উদ্ভব, বিকাশ, উল্লম্ফন হয়ে নতুন সমাজের সৃষ্টি সবই হয় প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতই বৈজ্ঞানিক নিয়মে। সমাজ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে মানব সমাজে উপস্থিত শ্রেণীগুলির (অর্থনৈতিক বর্গ) সম্পর্কের ভিত্তি হল তাদের মধ্যকার বৈষয়িক সম্পর্ক। এই বৈষয়িক সম্পর্কই অন্য সকল সম্পর্কের ভিত্তি। মানব সমাজে সামাজিক সত্ত্বার ফলশ্রুতি

হল সামাজিক চেতনা। সামাজিক সত্ত্বাই হল প্রথম এবং তাই সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে। আবার এই সামাজিক সত্ত্বা উৎপাদক শক্তির বৃদ্ধির ফলে পরিবর্তিত হয়। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে যেমন রয়েছে বৈপরীত্বের ঐক্য। মানব সমাজেও তেমনই শ্রেণীগুলির মধ্যকার বৈপরীত্বের ঐক্য বিদ্যমান। বিপরীতসমূহের ঐক্য হল সাময়িক আর বস্তু তথা সমাজের স্থিতাবস্থা ভেঙে নতুন শ্রেণীর তথা নতুন সমাজের উদ্ভব, পুরানো শ্রেণীর অবলুপ্তিই নিয়ম। বস্তুর বিকাশ যেমন মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ তেমনই মানব সমাজের বিকাশও ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই হয়ে চলে। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মতই সমাজ বিজ্ঞানীদের সেই অভিমুখ খুঁজে বার করে সেই বিকাশের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখেন।

ভারতের চলমান কৃষক আন্দোলনকে এই সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই বিচার করা বিজ্ঞানসম্মত। ভারতের কৃষিব্যবস্থা মধ্যযুগে যে সামন্ত সম্পর্কের মধ্যে ছিল তা অচল, অনড় নয়। প্রথমে সামন্ত সমাজের গর্ভেই নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সূচনা হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় বৈষয়িক সম্পর্কের পরিবর্তন সূচিত হয়। উপনিবেশিক শাসকদের এদেশে আগমন এই স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করলেও উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি বিবর্তনের ফলে এগিয়ে গেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরেও দেশী শাসকরা সামন্ত ভূমিসম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী রূপান্তরের জন্য সার্বিকভাবে কোন বাহ্যিক বল প্রয়োগ করেনি। নানা সময় তারা নিয়েছে আধা খেচড়া পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ হয়েছে এবং তার ফলে যে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি (কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের বিকাশ, সার-বীজ-কীটনাশক, বিদ্যুতের ব্যবহার এবং সর্বাগ্রে শ্রমশক্তি হিসাবে কৃষি শ্রমিকের বিকাশ) তা বর্তমান সমাজ আর ধারণ করতে পারছে না।

বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি-প্রযুক্তির মত কৃষিজ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি-প্রযুক্তি কার্যত মালিক হল বৃহৎ-অতিবৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলি। শিল্পজাত পণ্যের মত কৃষিজ পণ্যও বিশ্ববাজারের অধীন এবং সেই বিশ্ববাজারে চলছে এক ভয়াবহ মন্দা। এই একচেটিয়া পুঁজির হাত ধরে ভারতে যে কৃষি বুর্জোয়াদের জন্ম হয়েছে অতি উৎপাদনজনিত সংকটের ফলে তাদের বিকাশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এদের লাগাতার আন্দোলনে সরকার মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মাত্র ৬-১০ শতাংশ কৃষিমন্ডিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে আসছিল। বর্তমান আইনের ফলে এই বিক্রিটুকুর গ্যারান্টিও থাকছে না। এই আন্দোলনে সামিল আরতিয়া (মহাজন, যারা এই মন্ডিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঋণদান করে) দেরও বর্তমান আইন অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে বলে আতঙ্কিত হয়ে আন্দোলনের সর্বাগ্রে। ছোট ফার্মার, দরিদ্র কৃষক এবং ক্ষেতমজুররাও আন্দোলনে সামিল বড় ফার্মার এবং মহাজনদের সাথে বৈষয়িক সম্পর্কের কারণে। এখন প্রশ্ন হল নয়া তিনটি কৃষি আইন বাতিল হয়ে অবস্থা পূর্ববত থাকলে কি এদের সমস্যার সমাধান হবে? না, বিগত তিন দশকে কৃষক আত্মহত্যার তথ্যটুকুই তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। ফার্মাররা স্বাভাবিক কারণেই তাদের অস্তিত্বের সংকট থেকে বাঁচতে সরকারের কাছেই নয়া আইন বাতিল করে ফসল বিক্রির গ্যারান্টি চেয়েছেন। মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের অবসানের তা টেকনিক্যাল শর্ত পূরণ করতে সহায়তা করে। সমাজ প্রগতির গতিমুখ বিচার করলে এই দাবিটি তাই প্রগতিশীল জনতা সমর্থন করে। পুঁজিবাদী সমাজের এই সংকট ও ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের তাই দাবি তোলা উচিত **সমস্ত কৃষিজ ফসল লাভজনক মূল্যে সরকারকে ক্রয় করতে হবে।** এর সাথে আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমশক্তির বিক্রেতা শ্রমিকশ্রেণীর তথা সমগ্র শ্রমজীবী জনতার স্বার্থে দাবি তোলা উচিত **সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কিনে সুলভমূল্যে সরকারকে বন্টন করতে হবে।** এরই পাশাপাশি **সকল বেরোজগার মানুষের রোজগারের দাবি** তোলা উচিত। চলমান কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই দাবিগুলির ভিত্তিতে অংশগ্রহণই সমাজ প্রগতির স্বার্থবাহী। চলমান কৃষক আন্দোলনকে এই দাবিগুলির ভিত্তিতেই তাই বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ সমর্থন করে।■

বিজ্ঞানীর প্রতিবাদ

কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে অস্বীকার করলেন পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী বীরেন্দ্র পাল সিংহ। লুধিয়ানায় কর্মরত এই বিজ্ঞানী গাছের খাবার নিয়ে গবেষণার কারণে 'গোল্ডেন জুবিলি অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স'-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার মঞ্চে ওঠার পরে স্বর্ণপদক ফিরিয়ে দেন তিনি। বলেন, "দেশের কৃষকেরা যখন রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, তখন এই পুরস্কার গ্রহণ করতে আমার বিবেকে বাঁধছে।"■

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে

অতিথি কলম ঃ

করোনাভাইরাস – ২০১৯

– নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

[লেখক পরিচিত এবং প্রকাশনা ঃ লেখক প্রাক্তন অধ্যাপক ও এমেরিটাস বিজ্ঞানী, বসু বিজ্ঞানমন্দির, কলকাতা। এই প্রবন্ধ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ভিত্তিক প্রকাশিত "কাশফুল" পত্রিকা-শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, লেখকের অনুমতিক্রমে 'সমীক্ষণ' পত্রিকায় আবার প্রকাশ করা হল।]

ভাইরাস শব্দের অর্থ 'বিষ'। লুই পাস্তর **১৮৮০-র দশকে** পাগলা কুকুর কামড়ানো মানুষের শরীরে জলাতঙ্ক রোগের উৎত্তির কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা জেনেছিলেন যে সেই কারণটি ব্যাকটেরিয়া নয়। তারপর তিনি অনুমান করেছিলেন যে পাগলা কুকুরের শরীর থেকে কোনো এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ মানুষের শরীরে আসার ফলে ঐ রোগটির উৎপত্তি হয়। ঐ বিষাক্ত পদার্থটিকে 'ভাইরাস' (অর্থ বিষ) নামে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে জানা গেছে যে ঐ বিষ বা ভাইরাস আর কিছুই না, এক ধরনের অণুজীব যাকে ব্যাকটেরিয়া চেনবার উপযোগী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না, অর্থাৎ ব্যাক্টেরিয়া থেকেও ছোট। ভাইরাস অণুজীবগুলি নিজেরা স্বাধীন ভাবে জীবনের যে অন্যতম লক্ষণ বংশ বিস্তার করা – তা পারে না। এগুলি কোনো বিশেষ ধরনের জীবন্ত কোষের ভেতরে গিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে। এই কোষকে বলা হয় পোষক কোষ (হোস্ট সেল)। ব্যাক্টেরিয়া থেকে শুরু করে সব রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী (মানুষ সহ) কোষকে ব্যবহার করে বংশ বৃদ্ধি করবার মতো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বিবর্তিত হয়েছে। **১৯৩৯** সালে হেলমুট রুস্কা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করবার পর ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সকল প্রকার ভাইরাস এর আকার অবয়ব জানা সম্ভব হয়েছে। ভাইরাস কণার মধ্যে জিনবস্তু হিসাবে থাকে মাত্র এক প্রকার নিউক্লিয়িক অ্যাসিড,-ডিএনএ অথবা আরএনএ-এর একটি অণু। সেই নিউক্লিয়িক অ্যাসিড অণুটি একতন্তু অথবা দ্বিতন্তু হতে পারে। কিছু কিছু আরএনএ ভাইরাস-এ একের বেশি আরএনএ অণুও থাকে। ভাইরাস এর নিউক্লিয়িক অ্যাসিড অণুটি (গুলি) বিশেষ ধরনের প্রোটিন এর মোড়কের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ভাইরাস এর ডিএনএ বা আরএনএ অণু নিজ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক এবং মোড়ক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন নির্ধারক সুনির্দিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র জিন বহন করে। কিন্তু ঐ সকল জিন থেকে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরির জন্য যে আনুষঙ্গিক জীবরাসায়নিক পরিবেশ দরকার সেগুলি পোষক কোষ সরবরাহ করে। ভাইরাসগুলি পোষক কোষের বাইরে একেবারেই জড় রাসায়নিক যৌগ হিসাবে থাকে। পোষক কোষের সঙ্গে ভাইরাস-এর এ ধরনের জীবরাসায়নিক ঘাটতিপূরক সম্পর্ককে বলা হয় 'হোস্ট-পরজীবি' সম্পর্ক। পোষক কোষের ভেতরের জীবরাসায়নিক পরিবেশকে ব্যবহার করবার জন্য সকল ভাইরাসকেই তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট পোষক কোষের মধ্যে প্রবেশ করা দরকার যে কাজটি এরা কখনোই নিজে নিজে করতে পারে না; এজন্য পোষক কোষের বাইরের দিকে থাকা এক বিশেষ প্রোটিন এর সাহায্য নিতে হয়। কোষের ঐ বিশেষ প্রোটিনকে ভাইরাসটির রিসেপ্টর বা গ্রাহক প্রোটিন বলা হয়। নিজ নিজ পছন্দের গ্রাহক প্রোটিন-এর হাত ধরেই ভাইরাসগুলি তাদের পছন্দের পোষক কোষের মধ্যে প্রবেশ করে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ছাড়াও মানুষের শ্বাসযন্ত্রের কোষকে সংক্রমণ করবার মতো বেশ কয়েকটি অন্য ধরনের ভাইরাস বিভিন্ন সময়ে আবিস্কৃত হয়েছে। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিতে সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা এক বালকের শ্বাসনালি থেকে একটি ভাইরাস পাওয়া যায়। সেটির পরিচিতি ফলক দেওয়া হয় বি৮১৪। ঐ একই সময়ে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরনের ঠাণ্ডা লাগা এক রোগীর শ্বাসনালি থেকে আর একটি ভাইরাস এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ থেকে আর একটি ভাইরাস পাওয়া যায়। এগুলির পরিচিতি ফলক দেওয়া হয় যথাক্রমে ২২৯ই এবং ওসি-৪৩। এই ভাইরাসগুলি ইথার এর সংস্পর্শে এলে মারা যেত। এ থেকে ধারণা হল যে ভাইরাসগুলির বাইরের আবরণের মধ্যে লিপিড আছে। ১৯৬৭ সালে জুন অ্যালমেইডা, লণ্ডন এর তখনকার সেন্ট টমাস হসপিটাল মেডিক্যাল স্কুল-এ (অধুনা কিংস কলেজ) ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ-এ বি৮১৪ এবং ২২৯ই ভাইরাস দু'টির চেহারা কীরূপ তা দেখার চেষ্টা করেন। তিনি দেখেন যে এই দু'টি ভাইরাস-ই দেখতে একই রকম এবং এদের বাইরের দিকে খোঁচা খোঁচা স্পাইক আছে। ভাইরাসগুলির এরূপ মুকুটের মতো চেহারা দেখে নাম দেন করোনাভাইরাস (করোনা অর্থ ক্রাউন বা মুকুট)। এগুলি মানুষকে সংক্রমণ করে বলে এদের হিউম্যান করোনাভাইরাসও বলা হয়। ইতিমধ্যে বি৮১৪ ভাইরাসটি সংগ্রহশালা থেকে হারিয়ে যায়। এই ভাইরাসগুলি সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা ও সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি করত, এবং কখনো কখনো শ্বাসনালির নিম্নাংশের দিকেও সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হত যার ফলে নিউমোনিয়াও সৃষ্টি করত। ২০০২ সালে চিন-এ দেখা দিয়েছিল সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রোম করোনাভাইরাস

(সার্‌স-কোভ) এবং ২০০৪ সালে নেদারল্যাণ্ডে হিউম্যান করোনাভাইরাস এনএল-৬৩ (এইচকোভ-এনএল-৬৩)। এই দু'টি ভাইরাস কখনো কখনো নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি করত। তবে এদের মধ্যে সার্‌স-কোভ ভাইরাসটি সেই সময় প্রায় ৮,০০০ মানুষকে সংক্রমণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে ৭৭৪ জন মারা গিয়েছিল। ২০০৫ সালে দেখা দিয়েছিল হিউম্যান করোনাভাইরাস এইচকেইউ-১। এই ভাইরাসটি শিশুদের নিউমোনিয়া সৃষ্টি করেছিল কিন্তু পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে শতকরা মাত্র ১.৫ ভাগ শ্বাসকষ্ট ঘটাত। ২০১২ সালে আসে মিড্‌ল ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম করোনাভাইরাস (মার্‌স-কোভ) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে। এই ভাইরাসটি আগেরগুলির তুলনায় মানুষের মধ্যে অনেক বেশি ক্ষতিকারক ছিল। এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়েছিল ২,৪৯৪ জন মানুষ যাদের মধ্যে ৮৫৮ জন মারা গিয়েছিল। সার্‌স-কোভ এবং মার্‌স-কোভ-এই ভাইরাস দু'টি প্রাণী থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকেও মানুষে সংক্রমিত হয়। অবশ্য এইচকোভ-এনএল-৬৩ র ক্ষেত্রেও মানুষ থেকেও মানুষে সংক্রমণের উল্লেখ আছে। ২০১৯ সালের ১৭ই নভেম্বর আর একটি নতুন করোনাভাইরাস প্রথম মানুষে সংক্রমিত হয় চিন দেশের উহান শহরে সম্ভবত বন্য প্রাণী বিক্রির বাজার রক্ষিত বাদুড় থেকে এবং মানুষ থেকে মানুষে প্রথম সংক্রমণ ঘটে ২০২০ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে। এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগটি প্রথম উহান শহরে আত্মপ্রকাশ করবার পর থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বমহামারীর আকার নিয়েছে। এই ভাইরাসটির নাম দেওয়া হয়েছে করোনাভাইরাস-২০১৯ বা সার্‌স-করোনাভাইরাস-২ এবং সংক্ষেপে সার্‌স-কোভ-২। এই ভাইরাস সৃষ্ট রোগকে বলা হয় কোভিড-১৯।

সংক্রমণের সময় কত সংখ্যক ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে তার উপর ভিত্তি করে রোগ উপসর্গ প্রকাশ পেতে সময় লাগে ৪ থেকে ১৪ দিন (ইনকিউবেশন সময়)। সংক্রমণের সময় শরীরে বেশি ভাইরাস প্রবেশ করলে কম সময় এবং কম প্রবেশ করলে বেশি সময় লাগে উপসর্গ প্রকাশ পেতে। আবার খুব কম প্রবেশ করলে সংক্রমিত মানুষের শরীরের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা) ব্যবস্থা সেগুলিকে মেরে ফেলে সংক্রমণ ব্যর্থ করে দিতেও পারে। রিপোর্ট আছে যে একজন মানুষের শরীরে কমপক্ষে ১০০০ ভাইরাস সংক্রমণ করলে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষকে এই ভাইরাস খুব একটা কাবু করতে পারে না। যাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য অসুখে (মধুমেহ, উচ্চ রক্ত চাপ, কিডনি, হৃদ্‌যন্ত্র এবং ফুসফুস-এর অসুখ) ভুগে (কোমর্বিডিটি কেস) যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় – তাদের কাবু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর সম্ভাবনাও। রোগী যখন কাশে বা হাঁচে

১৯৬৭ সালের জুন মাসে লণ্ডনে
ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা করোনাভাইরাসের ছবি

তখন তার মুখ এবং নাক থেকে যেসব তরল কণা (৫-১০ মাইক্রন ব্যাস) এবং বাতাস বেরিয়ে আসে, সেই কণাগুলি এবং বাতাস কারও শরীরে (মূলত নাসা পথে) প্রবেশ করার মাধ্যমে ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটে।

উপরোক্ত সাতটি হিউম্যান করোনাভাইরাস-এর মধ্যে সার্‌স-কোভ, এনএল-৬৩ এবং করোনাভাইরাস-২০১৯ – এই তিনটি মানুষের শরীরের কোষঝিল্লির (মেমব্রেন) সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এসিই-২ নামে একটি প্রোটিনকে রিসেপ্টর হিসাবে ব্যবহার করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। বাকি চারটি ভাইরাস, এইচকোভ-২২৯ই, ওসি-৪৩, এইচকেইউ-১ এবং মারস-কোভ অন্য ধরনের আলাদা আলাদা প্রোটিনকে রিসেপ্টর হিসাবে ব্যবহার করে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের ফুসফুসের নিউমোসাইট বা অ্যালভিওলার কোষে এসিই-২ প্রোটিনটি বেশি পরিমাণে থাকে; তাই ঐ প্রথম তিনটি ভাইরাস এই কোষকে সংক্রমণের প্রধান নিশানা করে। ফুসফুস ছাড়া আরও কয়েকটি কলার কোষে এসিই-২ প্রোটিনটি কম পরিমাণে থাকে। এই কলাগুলি হল – ধমনী, কিডনি, হৃদযন্ত্র, ব্লাডার, অন্ত্রদ্বয়, নাকের ঘ্রাণ শনাক্তকারী কোষ এবং মুখের ভেতরের কিছু কোষে। কিছু দিন আগে একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে করোনাভাইরাস-২০১৯ এসিই-২ প্রোটিন ছাড়া স্নায়ুকোষের এক ধরনের প্রোটিন নিউরোপাইলিন ১ কে রিসেপ্টর হিসাবে ব্যবহার করে মস্তিষ্কে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সাতটি করোনাভাইরাস-ই নিজ নিজ স্পাইক এর সাহায্যে পোষক কোষের বহির্ভাগে থাকা ঐ সকল বিশেষ বিশেষ রিসেপ্টর প্রোটিন-এর হাত ধরে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পোষক কোষের এসিই-২ প্রোটিনটি একটি জটিল চক্রের মাধ্যমে আমাদের শরীরে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ-রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়।

এক একটি করোনাভাইরাস-২০১৯-এ (সম্ভবত অন্য ছ'টি করোনাভাইরাস এর ক্ষেত্রেও) প্রায় ৯০টি স্পাইক থাকে। এক

একটি স্পাইক তিন অণু এস প্রোটিন দিয়ে তৈরি। যে কোনো একটি স্পাইক-এর তিনটি এস প্রোটিন অণুর মধ্যে একটির এক বিশেষ অংশের সাহায্যে ভাইরাসটি কোষের এসিই-২ প্রোটিন এর সঙ্গে জোট বাঁধে এবং ঐ একই এস প্রোটিন-এর আর একটি অংশ কোষঝিল্লির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জুড়ে যায়। এর পর কিছু জীবরাসায়নিক ঘটনা ঘটে যার ফলে ভাইরাস এর এস প্রোটিন এবং কোষঝিল্লি – উভয়ের গঠনের কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসটি কোষে ভেতরে চালান হয়ে যায়। এরপর ভাইরাসটির সংখ্যাবৃদ্ধির সহযোগী বিভিন্ন ধরনের জীবরাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিশেষে পূণাঙ্গ ভাইরাসগুলি পোষক কোষকে ফুটো করে বেরিয়ে আসে। সংক্রমিত কোষ থেকে এই ভাবে বেরিয়ে আসবার সময় কোষের ঝিল্লি থেকে লিপিড অণু (সম্ভবত ঝিল্লির কিছু অংশ সহ) ভাইরাস কণার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এই ভাবে যে ভাইরাসগুলি বাইরে বেরিয়ে এল – এগুলি আশপাশের কোষকে সংক্রমণ করে। প্রতিটি সংক্রমিত কোষ থেকে কয়েক মিলিয়ন ভাইরাস বেরিয়ে আসে এবং ভাইরাসটির এরূপ একটি জীবনচক্র সম্পন্ন করতে লাগে ৭-৮ ঘন্টা।

করোনাভাইরাস-২০১৯ সংক্রমণের প্রধান লক্ষণ – জ্বর, গলা খুসখুসানির সঙ্গে শুকনো কাশি এবং ক্লান্তি। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায় – মাথা ধরা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কাশির সময় কফ বেরিয়ে আসা, শ্বাস কষ্ট, পেশী এবং গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, এবং ঘ্রাণশক্তি হারানো। রোগের মাঝগগনে জ্বর অনেক বেড়ে যায়, শ্বেত কণিকার পরিমাণ কমে যায় এবং কিডনি অকেজো হয়ে যায়। শেষ অবস্থায় নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং ফুসফুসে থ্রম্বোসিস ঘটে। করোনাভাইরাস-২০১৯ আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য সাধারণ শ্বাসরোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলি থেকে অনেকটাই বেশি। আক্রান্ত বয়স্ক মানুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করে, বিশেষ করে যদি কোমরবিডিটি কেস হয়।

সংক্রমণের প্রথম পর্বে নাক এবং মুখ-উভয় অঙ্গের কোষের মধ্যে ভাইরাসটির বংশবৃদ্ধি ঘটে। নাকের মধ্যে ভাইরাসটির বংশবৃদ্ধি সংক্রমণের প্রথম দিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য অনেকটাই দায়ী। এই সময় নাকের ঘ্রাণ শনাক্ত করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। উপসর্গ দেখা দেওয়ার ৫ দিনের মধ্যে নাক থেকে সংগৃহীত প্রতি সোয়াব নমুনায় কম-বেশি ছয় লক্ষ ভাইরাস পাওয়া যায়, কিন্তু দশ দিনের মাথায় আর ভাইরাস পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, উপসর্গ শুরুর প্রথম দিন থেকেই শ্বাসনালির উপরের দিক থেকে ভাইরাস এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং এই একই সময় থেকে ধীরে ধীরে ভাইরাসটির ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কমতে থাকে।

সংক্রমণের দ্বিতীয় পর্বে ফুসফুসের কোষে ভাইরাস-এর বংশ বৃদ্ধি শুরু হয়। যে সকল রোগীর প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে কাশি শুরু হয় তাদের শ্বাসনালির উপরের দিকেও ঐ সময় ভাইরাস-এর বংশবৃদ্ধি চলতে থাকে। অন্য দিকে নাকের মধ্যে ভাইরাস-এর পরিমাণ যখন থেকে কমতে থাকে তখন থেকে থুতুর মধ্যে ঐ পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং থুতুর মধ্যে ভাইরাস সংখ্যা সব থেকে বেশি হয় ১১ থেকে ১২ দিনের মাথায়।

করোনাভাইরাস-২০১৯ শরীরে প্রবেশ করবার পর তাদের প্রতিহত করবার জন্য শরীরের সহজাত অনাক্রম্যতা (ইমিউনিটি) ব্যবস্থা কাজ শুরু করে দেয় দু'ভাবে। (১) শরীরে আগে থেকে তৈরি থাকা ইন্টারফেরন ভাইরাসকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে এবং সেই সঙ্গে (২) প্রদাহ সৃষ্টিকারী কিছু ঘাতক রাসায়নিক অণু (সাইটোকাইন ও কেমোকাইন) উৎপাদন করে এবং শ্বেত কণিকার দু'টি সদস্য মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজ (ঘাতক কোষ)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। এই সকল ঘাতক অণু ও ঘাতক কোষ সৈনিক হিসাবে সংক্রমণের জায়গায় (সংক্রমিত কোষের পরিবেশে) এসে যথাক্রমে ভাইরাস এবং সংক্রমিত কোষকে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরে ফেলার কাজে লেগে পড়ে। এই ঘটনাগুলি ঘটবার সময় আশপাশের স্বাভাবিক কোষগুলিও অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় এসিই-২ প্রোটিন ফুসফুসের অ্যালভিওলার কোষের মধ্যে একধরনের সারফেকট্যান্ট অণু তৈরি করতে সাহায্য করে। ঐ অণুগুলি অ্যালভিওলার কোষের বহির্ভাগে এক প্রকার প্রলেপ বা পাতলা স্তর তৈরি করে যা ফুসফুসের বায়ুস্থলিগুলিকে খোলা রাখতে এবং অক্সিজেন ও কার্বনডাই-অক্সাইড আদান-প্রদান ঠিক ভাবে চালু রাখতে সাহায্য করে। করোনাভাইরাস-২০১৯ সংক্রমণের তৃতীয় পর্বে ফুসফুসের সংক্রমিত কোষ যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অধিকাংশ অ্যালভিওলার কোষ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সারফেকট্যান্ট তৈরির গতি ও পরিমাণ – দুই-ই কমে যায়। সেই অবস্থায় উপরোক্তকোষগুলি আর খোলা থাকতে পারে না। এরূপ পরিস্থিতিতে ঐসব ঘাতক অণু ও ঘাতক কোষ-এর পরিমাণ যদি এই যুদ্ধ জয় করবার পক্ষে অপ্রতুল হয় অথবা ঐ যুদ্ধ অনেক সময় ধরে চলতে থাকে, তখন ঐ সব প্রদাহ উদ্রেককারী রাসায়নিক অণুগুলির প্রভাবে বায়ুস্থলির আশপাশের রক্তজ্বালিকাগুলি ফুটো হয়ে যায়। এর ফলে ফুসফুস বিকল হয়ে যায়, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, ফুসফুসের তলীয় আয়তন কমে যায় এবং শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য অনাক্রম্যতা ব্যবস্থা আরো বেশি সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ঘাতক অণুর (সাইটোকাইন) উৎপাদন আরো বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। এভাবে সৃষ্ট অতি অস্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয় সাইটোকাইন স্টর্ম। এরূপ একটি পরিবেশে বেশি পরিমাণ সাইটোকাইন অণুগুলি রক্তজ্বালিকাকে প্রসারিত করবার মাধ্যমে আরো ভেদ্য করে তোলে এবং সংক্রমিত কোষকে মেরেও ফেলে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে শেষ পর্যায়ে

হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে অনাক্রম্যতা ব্যবস্থা অ্যাডাপটিভ (হার্ড) ইমিউনিটিকে সক্রিয় করে তোলে যার ফলে ভাইরাস-এর নির্দিষ্ট প্রোটিন অ্যান্টিজেন এস এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি এবং ঘাতক টি লিম্ফোসাইট কোষ উৎপাদন – এই দু'টি ঘটনা শুরু হয়। এই অ্যান্টিবডি তৈরির পথে প্রথমে অস্থায়ী অ্যান্টিবডি (আইজিএম) এবং পরে স্থায়ী অ্যান্টিবডি (আইজিজি) উৎপন্ন হয়। এই ভাবে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি এবং ঘাতক টিসি কোষ যথাক্রমে মুক্ত ভাইরাস এবং ভাইরাস সংক্রমিত কোষকে মেরে ফেলতে প্রবৃত্ত হয়।

কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে কোনো রকম আগাম জানান না দিয়েই রোগ খুব বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করে প্রায় দশ দিনের মাথায়। এই অবস্থায় অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম (আরডিএস), সাইটোকাইন স্টর্ম এবং মালটি-অর্গ্যান ফেলিওর – এই ঘটনাগুলি ঘটে। আরডিএস শুরু হওয়ার পর প্রদাহ অনেক বেড়ে যায় এবং অ্যালভিওলাস-এর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা (থ্রম্বোসিস) শুরু হয়। এই জমাট বাঁধা রক্তের মধ্যে ছোট টুকরোগুলি ফুসফুসের মধ্যে সরু রক্তজ্বালিকার ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। এর ফলে গ্যাস আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্তে অক্সিজেন-এর পরিমাণ স্বাভাবিকের অনেক নিচে নেমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে ওষুধ নানা ভাবে কাজ করে। অনাক্রম্যতা-নিয়ন্ত্রিত এই যুদ্ধের পথে অ্যান্টিবডি ও ঘাতক কোষকে সাহায্য করবার জন্য বাইরে থেকে শিরার ভেতর দিয়ে তরল পুষ্টি এবং নাসা পথে অক্সিজেন প্রয়োগ করা হয় এবং রোগীকে ভেন্টিলেশন-এ রাখা হয়। ইদানীং জানা গেছে যে করোনাভাইরাস সংক্রমণের পর প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাইটোকাইন এর অনুরূপ আর এক ধরনের অণু ব্র্যাডিকাইনিন এর পরিমাণ বেড়ে যায়, যার ফলে ফুসফুসে জল বা তরল জমতে থাকে এবং গোটা শরীর ফুলতে থাকে (ইডেমা)। এই সার্বিক ঘটনাটিকে বলা হয় ব্র্যাডিকাইনিন স্টর্ম।

করোনাভাইরাস-২০১৯ এর সংক্রমণ তথা সৃষ্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষেধক টিকা তৈরির কাজ চলছে। এই টিকার মূল উপাদান ভাইরাস এর স্পাইক প্রোটিন এস। বিভিন্ন কোম্পানি এই প্রোটিনটি উৎপাদন করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। এই প্রোটিনটি মানুষের শরীরে প্রয়োগ করলে এটির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় যা সংক্রমণ শুরুর সময় ভাইরাস-এর এস প্রোটিন-এর সঙ্গে কায়িকভাবে জুড়ে গিয়ে স্পাইককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যার ফলে ভাইরাস আর এসিই-২ রিসেপটর এর সঙ্গে জোট বাঁধতে পারে না এবং ভাইরাসটির সংক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক দেশই এই ভাইরাস এর প্রতিষেধক টিকা তৈরির চেষ্টা করছে এবং গত কয়েক মাসে প্রত্যেক দেশ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, ফ্রান্স, ইতালি, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশগুলি এই কাজে এগিয়ে গেছে অনেকটাই। ভারতেও অনেকগুলি কোম্পানি এই টিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই কোম্পানিগুলি হল – (১) জাইডাস ক্যাডিলা, (২) সিরাম ইনস্টিটিউট, (৩) বায়োলজিক্যাল ই, (৪) ভারত বায়েটেক, (৫) ইণ্ডিয়ান ইমিউনোলজিক্যালস, এবং (৬) মিনভ্যাক্স। লণ্ডন-এর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরূপ একটি ভ্যাকসিন প্রস্তুত হয়েছে যার নাম AZD1222 এবং এটি সেটি এখন মানুষের মধ্যে তৃতীয় ট্রায়াল চলছে। রাশিয়া থেকে স্পুটনিক নামে একটি টিকা এখন তৃতীয় দফার হিউম্যান ট্রায়ালে আছে। এই কাজে ভারতও সহযোগিতা করছে। সংক্রমণের পর রোগীর শরীরের মধ্যে ভাইরাস-কে মেরে ফেলার জন্য অন্য আর একটি পদ্ধতিও ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সকল মানুষ কোভিড-১৯ রোগ থেকে সদ্য আরোগ্যলাভ করেছে, তাদের রক্তে এই ভাইরাস এর অ্যান্টিবডি মোটামুটি একটি ভালো পরিমাণে থাকে। আরোগ্যলাভের পর যদি সেই সকল মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্য অনুমতি দেয় তাহলে তাদের শরীর থেকে কিছু পরিমাণ রক্ত বের করে নিয়ে তা থেকে প্লাজমা (রক্তের কণিকা-বর্জিত তরল অংশ) তৈরি করে ব্লাডগ্রুপ মিলিয়ে সদ্য করোনাভাইরাস-২০১৯ সংক্রমিত রোগীর শরীরে প্রয়োগ করলে ঐ দেওয়া রক্তের মধ্যে থাকা ভাইরাসটির অ্যান্টিবর্ডি শরীরের মধ্যে থাকা মুক্ত ভাইরাসগুলিকে মেরে ফেলবে।

সময়ের সঙ্গে অনেক নতুন নতুন তথ্য আসছে। যেমন, এখন কিছু কিছু রিপোর্ট আসছে যেগুলি থেকে জানা যায় যে কোনো কোনো কোভিড-১৯ রোগী সুস্থ হওয়ার বেশ কিছুদিন (২-৩ মাস) পর পুনরায় করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটবার পেছনে তিন রকমের সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে। (১) ভাইরাসটির মধ্যে মিউটেশন ঘটার মাধ্যমে এর নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন এস প্রোটিন এর মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে যে অব্যবহিত আগে ঐ একই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল, সেটিকে পরবর্তী সংক্রমণে জড়িত পরিবর্তিত ভাইরাসটি আর একদম গ্রাহ্য করছে না; (২) প্রথম সংক্রমণের ফলে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছিল তার কার্যকারিতা বেশি দিন থাকছে না; অথবা (৩) দ্বিতীয়বার অনেক বেশি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ ঘটলে আগে তৈরি অ্যান্টিবডির পরিমাণ যা থাকে তা ঐ বেশি পরিমাণ ভাইরাস এর সবগুলিকে মারতে পারে না। তবে এও ঠিক যে উপরোক্ত তিনটি সম্ভাবনাই ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত উপরোক্ত প্রথম সম্ভাবনার সমর্থন হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে পোষক কোষের মধ্যে এধরনের আরএনএ ভাইরাস-এর আরএনএ রেপ্লিকেশন-এর সময় জিনস্তরে পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটে মোটামুটি উচ্চ হারে। এর ফলে ভাইরাস-এর যে কোনো জিন-

এর মধ্যে পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা অনেকটাই থাকে। এই সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে, ভাইরাসটির স্পাইক প্রোটিন জিন-এও মিউটেশন ঘটবার সম্ভাবনা অনেকটাই থাকবে।

অন্য ভাবে ভাইরাস আরএনএ কোষের মধ্যে প্রবেশ করবার পর ঐ আরএনএ থেকে নতুন আরএনএ তৈরির সময় প্রধান রাসায়নিক উপাদান চার ধরনের রাইবোনিউক্লিওটাইড ক্ষারক (A, U, G, C) লাগে। সুতরাং ভাইরাস আরএনএ রেপ্লিকেশন-এর সময় ঐ চারটি ক্ষারকের মধ্যে যে কোনো একটির নকল চেহারার ক্ষারক কোষের পরিবেশে ছেড়ে দিলে আরএনএ সংশ্লেষণকারী উৎসেচকটি ঐ নকলটিকে আরএনএ-র মধ্যে আসলটির জায়গায় বসিয়ে দেবে। এর ফলে নতুন তৈরি আরএনএ ঐ ভাইরাসটির জীবনধর্ম পালনে ব্যর্থ হবে, ভাইরাসটির অপমৃত্যু ঘটবে। এইরূপ একটি নকল ক্ষারকের বাণিজ্যিক নাম রেমডেসিভির (একটি অ্যাডিনোসিন অ্যানালগ, যাকে আমরা নকল অ্যাডেনোসিন বলতে পারি) যা অ্যাডিনোসিন এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে নতুন তৈরি হতে থাকা আরএনএ-র মধ্যে স্বাভাবিক অ্যাডেনিন এর জায়গা দখন করে এবং ঐখানেই আরএনএ সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে যে এই ওষুধটি কোভিড-১৯ রোগীর শরীরে খুব ভালো কাজ করছে। তবে এটি অন্যান্য আরএনএ ভাইরাস এর মধ্যে মাত্র ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণে কিছুটা কাজ করে। ভারতে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide রাসায়নিকটি ফেবিপিরাভির ট্রেড নামে একটি নতুন ওষুধ বাজারে ছেড়েছে। আনবিক ওজনের দিক থেকে দ্বিতীয় ওষুধটি প্রথমটির থেকে অনেক ছোট। এই ওষুধটি আরএনএ রেপ্লিকেশন বন্ধ করে। আবার সিত্রমকে (daconoyl-RVKR-chloromethy lketone) নামে একটি ওষুধ ফিউরিন প্রোটিয়েজের কাজে বাধা সৃষ্টি করবার মাধ্যমে ভাইরাসটির সংক্রমণ রুখতে পারে। অন্য দিকে কোভিড-১৯ মহামারীর ঘটনা শুরু হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে প্রকৃতি থেকে পাওয়া হাজার হাজার রাসায়নিক অণু পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সেগুলির মধ্যে কম-বেশি এমন ৪০টিকে শনাক্ত করেছেন যেগুলি এই ভাইরাস এর বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। খুবই আশার কথা। আবার অনেকে দেখিয়েছেন যে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন কিছু কিছু কোভিড-১৯ রোগীর ক্ষেত্রে কাজ করছে। প্রথম প্রথম যদিও অধিকাংশ বিজ্ঞানী এব্যাপারে একমত ছিলেন না, এখন জানা গেছে যে বিশেষ করে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধটি জিঙ্ক-এর উপস্থিতিতে এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রথম ধাপে কোষের এসিই-২ রিসেপটর প্রোটিন-এর সঙ্গে স্পাইক প্রোটিন-এর জোট বাঁধায় বাধার সৃষ্টি করে যার ফলে সংক্রমণ সফল হয় না।

রোগী যখন হাঁচে বা কাশে, তখন তার মুখ ও নাক থেকে তরল কণা (৫-১০ মাইক্রোমিটার ব্যা) বেরিয়ে আসে (এমনকী সাধারণ ভাবে কথা বলবার সময়ও অনেকের মুখ থেকে তরল কণা ছিটিয়ে পড়ে)। সেই কণাগুলি বাতাসের মধ্যে দিয়ে ঐ রোগীর কাছাকাছি থাকা অন্য মানুষের নাসাপথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। সামনে দ্বিতীয় মানুষ না থাকলে অপেক্ষাকৃত বড় কণাগুলি কিছুটা ভারী হওয়ার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে মাটিতে স্থান করে নেবে। কিন্তু সামনে কাছাকাছি মানুষ থাকলে এবং তার নাক-মুখ খোলা থাকলে তার শরীরে ভাইরাসবাহী তরল কণা প্রবেশ করতে পারে। এই ভাবে ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটে। সংশ্লিষ্ট দু'টি মানুষের মধ্যে দূরত্ব যত বাড়বে, ততই ঐ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমবে। সুতরাং, সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে হলে রোগীর থেকে অন্য মানুষের কমপক্ষে একটা সামাজিক দূরত্ব* (ছয় ফুট) বজায় রেখে চলা এবং মাস্ক দিয়ে মুখ ও নাক ঢেকে রাখা – এই প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই দরকার। দেখা গেছে যে মাস্ক না পরে যখন একজন করোনারোগী এবং একজন স্বাভাবিক মানুষ মুখোমুখি খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলে তখন প্রথম মানুষটি থেকে দ্বিতীয় মানুষটির মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগেরও বেশি থাকে। আর যদি রোগী মাস্ক পরে থাকে, তাহলে মাস্কহীন দ্বিতীয় জনের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগে নেমে যায়। আর যখন উভয়েই মাস্ক পরে থাকে তখন সেই সম্ভাবনা শতকরা ৫ ভাগে নেমে যায়।

শরীরের বাইরে বিভিন্ন অবস্থানে ভাইরাসটি কতদিন বা কত ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে – সে সম্বন্ধেও গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় অবহিত করা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। তবে বাতাসে ভাইরাসটির উপস্থিতি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। হাঁচি, কাশি এমনকী সাধারণ কথা বলবার সময় বড় তরল কণা ছাড়াও অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র তরল কণাও (মাইক্রোড্রপলেটস) বেরিয়ে আসে। বেরোবার অব্যবহিত পরেই সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলির তরল অংশ বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এই ভাবে কণার তরল অংশটি শুকিয়ে গেলেও তদ্বারা বাহিত ভাইরাসগুলি ড্রপলেট নিউক্লিয়াস হিসাবে রোগীর আশপাশের বাতাসে মিশে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। বাতাসে এরূপ প্রলম্বিত অবস্থায় ভাইরাসটি কয়েক ঘন্টা (২-৩ ঘন্টা) বেঁচে থাকতে পারে। এইভাবে যদি রোগীর শরীর থেকে ভাইরাস নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আশপাশের বাতাসে যোগ হতে থাকে, তাহলে সেই পরিবেশের বাতাসে ভাইরাসটির পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকবে। সেই পরিস্থিতিতে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকার একটি নির্দিষ্ট অর্ধজীবনকাল অথবা একটি গড় জীবনকাল মেনে ভাইরাসগুলি ঐ বাতাসের মধ্যে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে এবং বাতাসের

***লেখক এখানে দৈহিক দুরত্বকেই বোঝাতে চেয়েছেন – মন্তব্য সমীক্ষণ সম্পাদক।**

পরিচলনের মাধ্যমে সেগুলির বেশ কিছু দূর ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকবে। বিশেষ করে যে অঞ্চলে অনেক বেশি রোগী থাকে (কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং হাসপাতাল এর করোনাভাইরাস ওয়ার্ড, তথাকথিত হট জোন অঞ্চল) সেখান থেকে বাতাসের মাধ্যমে এই ভাইরাস বাহিত হয়ে রোগীহীন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ভালো রকম থাকবেই। এই জন্যই সকল মানুষের মাস্ক পরিহিত অবস্থায় পথে বেরোনো নিজেদের এবং অন্যদের সুরক্ষার জন্য দরকার। আবার মাস্ক ব্যবহারের কিছু শর্ত মনে রাখাও দরকার। এই করোনাভাইরাসগুলি ৬৫-১২৫ ন্যানোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট এক একটি গোলাকাকার কণা। একে ছেঁকে বাদ দিতে হলে মাস্ক এর ছিদ্রগুলির ব্যাস ভাইরাস এর ব্যাস থেকে ছোট হওয়া দরকার যা বোধ হয় কখনো সম্ভব নয়। তবে করোনা-ভাইরাসগুলি যখন তরল কণার মধ্যে থাকে, সেই কণার কার্যকর ব্যাস অনেক বেশি হয়, যার মান নির্ভর করে ঐ কণার মধ্যে কতগুলি ভাইরাস কণা ঠাসা আছে-তার উপর। অন্য দিকে মাস্ক এর স্তর সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই তার ছাঁকবার দক্ষতা আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। কারণ, দুই বা তার বেশি স্তরের চাপাচাপি অবস্থানের ফলে ছিদ্রগুলি আর প্রত্যক্ষ ভাবে মুখোমুখি থাকে না। এন-৯৫ মাস্কটি পঞ্চস্তরীয়। এই মাস্ক করোনাভাইরাস এর শতকরা ৯৯.৫ ভাগকে ছেঁকে বাদ দিতে পারে। বাজারে নানা ধরনের মাস্ক দেখা যায়। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগ হয়তো ছিদ্রবিধি মেনে তৈরি করা হয়নি। এধরনের মাস্ক পরে বিপদমুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আবার বাজারে গেলে দেখা যায় অনেকেই কথা বলবার সময় নাক, এমনকী মুখ থেকে মাস্ক সরিয়ে রাখে, বা বেশির ভাগ সময় নাক থেকে নামিয়ে রাখে। এই সকল মানুষ মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব না বুঝেই নিয়মরক্ষীদের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য মাস্ক গলায় ঝুলিয়ে রাখে। এ ধরনের অভ্যেস ত্যাগ করা উচিত। বাইরে থেকে বাড়িতে আসবার পর পোষাক পরিবর্তন করা, হাত, পা, মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধোয়া বা স্নান করা অবশ্যই বাড়তি সতর্কতার মধ্যে পড়ে।

যেহেতু নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে ভাইরাসটির সংক্রমণ ঘটে এবং হাতের আঙুল ও চেটো বিভিন্ন ভাবে ভাইরাস-এর সম্পর্শে আসতে পারে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম সাবধানতা হলো মাঝে মাঝে হাত সাবান দিয়ে ধোয়ার অভ্যেস করা। যাদের হাতের আঙুল বা আঙুলের নখ দিয়ে দাঁত ও নাক খোটানো অভ্যেস আছে তাদের এই বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। বাড়ির বাইরে বেরোবার সময় ভালো মানের মাস্ক দ্বারা মুখ ও নাক ঢেকে নিতে হবে। বাড়ির মধ্যে যদি কোনো রোগী না থাকে তাহলে বাড়ির মধ্যে হাত ধোয়া ছাড়া অন্যান্য সাবধানতার খুব একটা কড়াকড়ির দরকার নেই। মোড়কের বাইরে লিপিড থাকার জন্য ভাইরাসটি যেখানে পড়বে সেখানেই আটকে যাবে- তেল যেমন কোনো জিনিষের উপর পড়লে আটকে যায়। একবার ঐভাবে আটকে গেলে ভাইরাসটি সহজে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না যদি না বল প্রয়োগ করা হয়। ঐ আটকে থাকা ভাইরাস-কে মারতে বা তাড়াতে হলে সাবান ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং, ভাইরাসটি কোনো জায়গায়, কাপড়-চোপড়ে, খবরের কাগজে, বাসনপত্রে এমনকী আমাদের গায়ে, হাতে এবং পায়ে আটকে গেলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং, ঐ সকল জায়গা থেকে নাসাপথে শরীরে ঢোকার সম্ভাবনা একদম নেই বললেই চলে। তবে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলি বেশি জোরে ঝাড়াঝাড়ি করলে ওখান থেকে কিছু ভাইরাস বেরিয়ে আসতে পারে। সব সময় হাতটা নাক, মুখ এবং চোখ থেকে দূরে রাখা দরকার এবং হাতের তালু মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে ভালো করে ধোয়া দরকার। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক দূরত্ব (কমপক্ষে ৬ ফুট) বজায় রেখে চলাফেরা করা বা লাইনে দাঁড়ানো – এই নিয়মগুলি প্রত্যেকের মেনে চলা উচিত।

ভাইরাস-এর জিনবস্তুটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন এর মোড়কের মধ্যে থাকে এবং ঐ মোড়কের বাইরের দিকে থাকে লিপিড (ফ্যাট)। যে সব বস্তু ভাইরাস কণার সঙ্গে জড়িত লিপিডকে দ্রবীভূত করতে পারে অথবা মোড়কের উপাদান প্রোটিনগুলির স্বাভাবিক গঠন ওলট-পালট করে দিতে পারে, সেই সব বস্তু ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। যেমন, অ্যালকোহল, সাবান, ইথার, ক্লোরোহেক্সিডিন, মোটামুটি শক্তিশালী অ্যাসিড এবং অ্যালক্যালি। এগুলির মধ্যে অ্যালক্যালি ও অ্যাসিড ভাইরাস কণার মধ্যে থাকা প্রোটিনগুলির স্বাভাবিক কার্যকর আণবিক গঠন নষ্ট করে দেয়, আর অ্যালক্যালি জিনবস্তু আরএনএ-কে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেয়। অন্য দিকে সাবানের অণুগুলি এমন একটি মিনিচক্রব্যুহ রচনা করে যার মধ্যে ভাইরাস কণা (এবং ময়লা কণা) এমন ভাবে বন্দী হয়ে যায় যে সেখান থেকে ওগুলি আর বেরোতে পারে না। অন্যদিকে ভাইরাস কণার মোড়কের গায়ে থাকা লিপিড নিজের বিশেষ স্বাভাবিক আণবিক গঠন নিয়ে অবস্থান করে। কিন্তু পরিবেশের তাপমাত্রা একটি সীমা (৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অতিক্রম করলে লিপিড এর সেই গঠন নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঐ তাপমাত্রার উপরে ভাইরাসটির জীবিত থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। এই তাপমাত্রায় ৩০ ডিগ্রির উপর যে কোনো তাপমাত্রায় ভাইরাসটি যত বেশি সময় থাকবে, সংক্রমণ ক্ষমতা হারানো ভাইরাস-এর পরিমাণও ততই বাড়বে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে বেশি ক্ষতিকারক হলেও, ভয়ে আড়ষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। এমন কিছু ঘটনা জানা গেছে যেখানে কোনো মানুষের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়বার পর আত্মহননের পথ অবলম্বন করেছেন। শরীর থাকলে রোগ হবেই – এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মানুষের

শরীরে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা নতুন নয়, আদিকাল থেকে ঘটে আসছে। জীবন বিবর্তনের শুরু থেকেই সকল রকম জীব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে বিভিন্ন ধরনের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে আসছে। সেই প্রেক্ষাপটে মানুষের শরীরও বাইরে থেকে প্রবিষ্ট বিভিন্ন ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে অভ্যস্ত। শরীরের ভেতর থেকে এই লড়াই-এর মূল উদ্যোক্তা অনাক্রম্যতা ব্যবস্থা। শরীর অনাক্রম্যতা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করবার মাধ্যমে এই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে (আগে আলোচিত)। সুতরাং, রোগটিকে জয় করতে হলে অনাক্রম্যতা ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে এবং তার জন্য উপযুক্ত পুষ্টি গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনাক্রম্যতা শক্তি বাড়ানোর পথে বেশ কয়েকটি ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভালো রকম সাহায্য করে। এগুলি হলো – ভিটামিন সি, ডি, এবং ই। ভিটামিন সি এবং ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবেও কাজ করে। এগুলি ছাড়া পরিমিত প্রোটিন (শরীরের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ১-১.২ গ্রাম প্রতি দিন) এবং ফল দৈনিক খাদ্য তালিকায় রাখা দরকার। মনকেও চাঙ্গা রাখতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। গত মে মাসের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে একজন ১১৩ বছর বয়স্কা ইতালিয় মহিলা মারিয়া অ্যানিয়াস করোনাভাইরাস-২০১৯ আক্রান্ত হয়েও আরোগ্যলাভ করে বহাল তবিয়তে আছেন। উল্লেখ্য যে ঐ মহিলা ১৯১৮ সালে ১১ বছর বয়সে স্প্যানিশ ফ্লুতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। ভারতেও ৮০ বছরের বেশি কিছু মানুষেরও করোনাভাইরাস-২০১৯ আক্রান্ত হয়ে আরোগ্য লাভ করবার খবর আছে। সুতরাং, ভয় না পেয়ে ভাইরাসটির বিরুদ্ধে লড়াই করবার মনোভাব তৈরি করা দরকার। তবে এও মনে রাখতে হবে বয়স যখন ৬০ পেরিয়ে বিভিন্ন ধাপে এগিয়ে যায় তখন সেই সকল মানুষদের সতর্ক থাকা বা নিশ্চিদ্র সাবধানতা অবলম্বন করা খুব বেশি দরকার। খেয়াল রাখতে হবে যে, সময়ের সঙ্গে উপসর্গহীন সংক্রমণের ঘটনা ক্রমে বাড়ছে।

বাদুড়ের সঙ্গে ভাইরাস-এর বাহক বা প্রতিপালক-আশ্রিত সম্পর্কের পেছনে রহস্য এখন কিছুটা জানা গেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে মোট ১৪০০ প্রজাতির বাদুড় আছে। এরাই স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে যাদের এত বেশি প্রজাতি আছে। এদের প্রায় সকল প্রজাতিই করোনাভাইরাস সহ বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, কিন্তু নিজেরা কখনো অসুস্থ হয় না। কেন বা কী ভাবে বাদুড়গুলি এধরনের ভাইরাস-সহনশীলতা ধর্ম অর্জন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর জানবার প্রথম পদক্ষেপ হিসবে বিজ্ঞানীরা ১৪০০ প্রজাতির মধ্যে ১০০০ প্রজাতির বাদুড়ের ডিএনএ-র ক্ষারক সজ্জাক্রম নির্ণয় করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই ১০০০ প্রজাতির মধ্যে ৬ প্রজাতির ফলাফল এখন জানা গেছে। বাদুড়ের এই ডিএনএ সজ্জাক্রমের সঙ্গে শূকর ও মানুষ সহ ৪০টি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ডিএনএ সজ্জাক্রমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে যে সকল তথ্য জানা গেছে সেগুলির মধ্যে ভাইরাস সম্পর্কিত তথ্যগুলি হলো – (১) অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের যে দশটি জিন যে কোনো ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ প্রভাবিত অনাক্রম্যতা নিয়ন্ত্রিত প্রদাহ সৃষ্টি করে, সেই জিনগুলি কোনো প্রজাতির বাদুড়ের শরীরে সক্রিয় নেই এবং সেই সঙ্গে এমন কিছু পরিবর্তিত ভাইরাস-বিরোধী জিন আছে যেগুলি সম্ভবত বাদুড়কে ভাইরাস সহনীয় করেছে। (২) বাদুড়ের ডিএনএ-র মধ্যে এমন সব ডিএনএ অংশ দেখা গেছে যেগুলি আগে কোনো ভাইরাস সংক্রমণের সময় ভাইরাস জেনোম থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে থাকা অ-বাদুড়ীয় জিনগুলি পূর্বেকার ভাইরাস সংক্রমণের নমুনা হিসাবে থেকে গেছে। এই তথ্যগুলি থেকে মনে করা হয়েছে যে, বাদুড় বিবর্তিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের পাখি-নির্দিষ্ট ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে। এর ফলেই বাদুড় প্রজাতিগুলি ভাইরাসসহনশীলতা অর্জন করেছে, ঠিক অ্যান্টিবায়োটিক সহনশীল বা রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়ার মতো। বাদুড় ও ভাইরাস-এর প্রতিপালক-আশ্রিত সম্পর্কের জেরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যদি বাদুড়ের শরীরে একই প্রজাতির দু'টি ভাইরাস একই সময়ে প্রতিপালিত হতে থাকে তাহলে ঐ দু'টি ভাইরাস-এর মধ্যে জিন এর অদল-বদল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই থাকে। এর ফলে বাদুড়ের মধ্যেই নতুন ধর্ম বিশিষ্ট ভাইরাস উদ্ভব হতে পারে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বাদুড় ভাইরাস বিবর্তনের এক জীবন্ত বীক্ষণাগার হিসাবে কাজ করে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই ধরনের একটি মারাত্মক অণুজীবকে কি মানুষ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে পারে? এব্যাপারে বিশদ আলোচনার পরিসর এখানে নেই। তবে কিছুটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। গত ৫০-৬০ বছরে জীবন বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে এসেছে যার ফলে আণবিক জিনবিদ্যা ও জিন-প্রযুক্তি সম্পর্কিত অনেক অভিনব পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প এবং বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে। কেউ যদি সেই সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে বীক্ষণাগারে ঐ ধরনের একটি ভয়ঙ্কর ধর্মবিশিষ্ট অণুজীব বানানোর পরিকল্পনা করে, তাহলে সেই পরিকল্পনা যে সফল হবে না – এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই ভাবেই তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে সব রকমের ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে আণবিক বোমা বানানো হয়েছিল এবং জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল জাপানকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে। তবে কীভাবে এই অদৃশ্য দুশমন ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে সংহারক রূপ নিয়ে পৌঁছেছে – সেই সত্যটি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই উদ্ঘাটিত হবে।■

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ

মানবজাতির প্রথম টিকা আবিষ্কারের পথিকৃৎ এডওয়ার্ড জেনার

– পঞ্চানন মন্ডল

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাবো কালে কালে কোভিড-১৯ এর মত এমন প্রাণঘাতী বেশ কয়েকটি মহামারিতে আক্রান্ত হয়েছেন বহু মানুষ। মারা গেছেন কোটি কোটি মানুষ। চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এসব মহামারির প্রতিষেধক তৈরিতে নেমেছিলেন এক অসম যুদ্ধে। দীর্ঘদিনের গবেষণা আর প্রাণান্তকর সাধনার পর তাঁরা এমন রোগগুলোর ওষুধ আবিষ্কারে সাফল্যের দেখা পেয়েছেন। রোগের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য টিকা আবিষ্কার করেছেন। তাই ইতিহাসের খাতায় সেইসব মানুষগুলোর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জলবসন্ত বা চিকেন পক্স রোগটির সঙ্গে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। অনেকেই জীবনে একবারের জন্য হলেও এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু গুটিবসন্ত বা স্মলপক্স নামের অন্য এক প্রকার বসন্ত রোগ সম্পর্কে আমরা ক'জনই বা জানি? হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এক সময়ের প্রাণঘাতী এই মহামারি এখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত। অষ্টাদশ শতকে গুটিবসন্ত ছিল এক ত্রাসের নাম। করোনার মতো তখনও লাখ লাখ মানুষ গুটিবসন্ত মহামারিতে প্রাণ হারিয়েছেন। গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গেছে।

আমাদের গ্রাম বাংলায় একে সবাই বলতো "মায়ের দয়া"। এখানে 'মা' মানে 'মা শীতলা'। গ্রামে গ্রামে "মায়ের দয়া" যাতে না হয় তাই মা শীতলার পুজো হতো। এখনো অনেক গ্রামে হয়। তবে টিকা আবিষ্কারের পর এখন এদেশে এই রোগ নেই। তাই শীতলা পুজোতেও ভাটার টান! তবে গ্রামে গ্রামে এখনো শীতলা মণ্ডপ আছে। যখন মানুষ কোন রোগের প্রাদুর্ভাবে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পরে, জানে না তারা চিকিৎসাবিধি তখন সে বিশ্বাস করে বিভিন্ন কুসংস্কারে। এই বিষয়ে দেশ, ধর্ম, জাতিতে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে যখন মানুষ স্বাস্থ্যবিধি শিখল, এন্টিবায়োটিক ও প্রতিষেধক মানে টিকা আবিষ্কৃত হল তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আস্থা এল আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে।

এখন আবার গুটিবসন্ত রোগের কথায় আসি।

গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর সারা শরীর ছোট ছোট গুটি বা ফুঁসকুড়িতে ভরে যেত। এ রোগটি ছিলো ভয়ানক ছোয়াঁচে। গুটি ফেটে গিয়ে পুঁজ যদি অন্য কারো দেহে সামান্য পরিমাণেও লাগতো, তবে তার ফল হত মারাত্মক! সেই সুস্থ ব্যক্তিও তখন আক্রান্ত হতো মারাত্মক এই রোগে, ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। পুরো পৃথিবীজুড়ে তখন সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ কীভাবে এ মৃত্যুদূতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

তখনকার দিনে গুটিবসন্তের কিছু কিছু চিকিৎসা যে প্রচলিত ছিল না তা কিন্তু নয়। গুটিবসন্ত আক্রান্ত ব্যক্তির শুকনো গুটি থেকে মরা চামড়া তুলে সুস্থ মানুষের শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে সুস্থ ব্যক্তিটি কিঞ্চিৎ গুটিবসন্তে আক্রান্ত হত এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার তৎপরতার কারণে গুটিবসন্তের সেই হালকা আক্রমণ রোধ করা যায়। শরীর যদি একবার হালকা গুটিবসন্ত প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, তবে পরবর্তীতে আর 'মারাত্মক' গুটিবসন্ত হয় না। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইনোকুলেশনক বা ভ্যারিওলেসন। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ছিল অনেক বিপত্তি। অনেক সময় ঐ ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সামান্য গুটিবসন্তের বদলে মারাত্মক গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়ত। এ কারণে ইনোকুলেশন প্রক্রিয়ায় ছিল অনেকেরই অনীহা।

এমন পরিস্থিতিতে প্রথম টিকা আবিষ্কারের কাহিনীতে যাওয়া যাক। বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনারেলকে বলা হয় টিকার জনক।

এডোয়ার্ড জেনার ১৭ই মে, ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের গ্লৌচেস্টারশায়ারের বার্কলেতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বার্কলের উপাচার্য, এই কারণে জেনারের প্রাথমিক শিক্ষা ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাকে স্মল পক্সের জন্য ভারিওলেসন (আদিম টিকাদান পদ্ধতি) করা হয়, যা তাঁর স্বাস্থ্যে সুদূর প্রভাবে ফেলেছিল। ১৪ বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষানবিশ হিসেবে সার্জন ড্যানিয়েল লুডলর কাছে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি নিজে সার্জন হিসেবে

প্রয়োজনীয় সমস্ত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের অধীনে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে তিনি সার্জারি ও অ্যানাটমি বিভাগে যোগদান করেন। হান্টারই তাঁকে ন্যাচারাল হিস্ট্রির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং রয়াল সোসাইটিতে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে জেনার বার্কলেতে ফিরে আসেন এবং একজন সফল ডাক্তার এবং সার্জন হিসেবে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

শিক্ষানবিশ থাকাকালীন জেনার একটি মেডিকেল সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন ডানিয়েল লুডল এবং জন ফিউস্টার। ফিউস্টারের থেকেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে কোন ব্যক্তি গোবসন্তে সংক্রমিত হলে, তার গুটিবসন্ত হবে না।

এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ও কর্মস্থল ইংল্যান্ডের বার্কলেতে। বার্কলে থেকেই গুটিবসন্ত নিয়ে তাঁর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু। যদিও ছাত্রজীবন থেকেই ভয়াবহ গুটিবসন্ত রোগটি সম্পর্কে তাঁর মনে আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। নানা রকম প্রতিকূলতা ও নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন তিনি। তিনি, জন ফিউস্টারের থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিজস্ব অনুসন্ধান (দীর্ঘ ২৫ বছর ব্যাপী) চালিয়ে এই ধারণায় পৌঁছান যে গরুর স্তনে যে ঘা হয়ে থাকে, তার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। মানুষও এই একাধিক কারণজনিত সংক্রমণে সংক্রমিত হতে পারে। কখনও সেটা স্ট্যাফাইলোকক্কাল ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, কখনও সেটা ভাইরাস জনিত। ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ গরুর স্তনবৃন্ত ছাড়িয়ে অনেকটা অঞ্চলে প্রসারিত হয়, যা ভাইরাল সংক্রমণে হয় না। আশ্চর্য বিষয় সে যুগে এই ব্যাকটেরিয়াল ও ভাইরাল সংক্রমণকে পৃথকীকরণের কোনো যান্ত্রিক সাধন ছিল না। কেবলমাত্র গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বলে তিনি এই কাজটা কষ্টসাধ্য উপায়ে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

তখনকার সময়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতদূর হয়েছে, তাই সম্বল করে ভীষণ রকম নিবিড় অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা, যতদূর সম্ভব সতর্কতা নিয়েই গোবসন্তের পুঁজ দিয়ে ইনোকুলেট করেছিলেন একটি শিশুকে। তিনি সারা নেম্লস্ নামের এক গোয়ালিনীর দেহে উপস্থিত গোবসন্তের পুঁজ নিয়ে তাঁরই বাড়িতে কর্মপ্রার্থী একটি আট বছরের সুস্থ শিশুকে ইনোকুলেট করেছিলেন। এটাই মানবজাতির তৈরি প্রথম টিকা, যা ভ্যাকসিন নামে নামাঙ্কিত হয় পরে। কারণ এই ইনোকুলেশন হয়েছিল ল্যাটিন শব্দ ভ্যাক্কা, যার অর্থ গরু। অর্থাৎ গরুর থেকে সংক্রমিত ভাইরাসের জীবাণু দিয়ে ইনোকুলেশন।

যেহেতু অল্প বয়সেই জেনারকে ইনোকুলেশন করা হয়েছিল, তাই এই পরীক্ষা নিজ দেহে করা সম্ভব হয়নি। তিনি যে দরিদ্র শ্রমজীবীর সন্তানের দেহে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সে বিষয় অনেকে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। রয়াল সোসাইটি, মেডিসিন দ্বারা প্রকাশিত প্রবন্ধে এ বিষয় বলা হয়েছে যে সেই সময় বাড়িতে আসা কর্মপ্রার্থীরা আগে থেকে সংক্রমণের শিকার না হলে অভিজাত পরিবারে কাজ পেত না। গৃহস্থরা ভয় পেত যে যদি কর্মে নিয়োগের পর কাজের লোকটি সংক্রমিত হয়, তবে যেমন সংক্রমণের বিপদ আছে, তেমনি তার সবরকম দেখভাল, মৃত্যুর পর কবর দেওয়ার খরচ পর্যন্ত ভার বহন করতে হত তার মালিককে। এই কারণে নিয়োগকর্তারা সতর্ক থাকতেন এ বিষয়ে।

এই কারণেই জেনার, নাবালক ফিপ্পসকে টিকাকরণের জন্য সম্মতি তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই সময় প্রতি ৫০০ জনে ইনোকুলেশনে মৃত্যুর হার ছিল একজনেরও কম।

ফিপ্পস্‌কে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর প্রথাগত উপায়ে ইনোকুলেট করা হয়। যদি গোবসন্তে সাফল্য না পাওয়া যেত, তবে তার সামান্য ইনোকুলেশন জনিত প্রতিক্রিয়া হত। জেনার এমনই ধারণা করেছিলেন। যদিও অল্প সম্ভাবনা থাকলেও ঝুঁকি থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত ভ্যাকসিনেসন পদ্ধতি স্বীকৃতি পায়, এবং ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইনোকুলেশন নিষিদ্ধ করে ও বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেসন পদ্ধতির সূচনা করে।

এই সাফল্যের খবর সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমেরিকা, ফিলিপিন্স, ম্যাকাও ও চিনে ফ্রাঞ্চকো জাবিয়ার ডি বাল্মিসের অধীনে মিশনে হাজার হাজার লোককে স্মল পক্স-এর টিকা দেওয়া হয়।

জেনার এর অবিরত গবেষণা তাঁর সাধারণ ডাক্তারি পেশায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর সহকর্মীরা এবং রাজা তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, এবং ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে সংসদ এর পক্ষ থেকে তাঁকে ১০,০০০ পাউন্ড দেওয়া হয়। ভ্যাকসিনেসন পদ্ধতির সুদূর প্রসারি অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে আরও ২০,০০০ পাউন্ড প্রদান করা হয়।

জেনার ছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের খুবই প্রিয়ভাজন। নেপোলিয়ন নিজে তার হাতে টিকা নিলেন। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জেনারকে সম্মানিত করতে লাগল। বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হল।

এরপর একে অনেক দেশই আইন করে টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করল।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দে জেনার 'অ্যামেরিকান একাডেমী অফ

ব্যতিক্রমী এক পথ প্রদর্শক – কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

– নিবেদিতা হাজরা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেমন ছিল ভারতের মেয়েদের অবস্থান? খুব সাধারণ কথায় বলা যেতে পারে – একেবারেই অসহায় এবং অত্যাচার ও অবিচারের শেষ পর্যায়ে ছিল তাঁদের অবস্থান। অশিক্ষা, প্রাচীন সংস্কার, অসহনীয় প্রচলিত প্রথার জালে নারীর জীবন ছিল সর্বনাশের সর্বনিম্ন স্তরে। বাল্য বিবাহ, সতীদাহর মতো নিষ্ঠুর, নৃশংস প্রথার বেড়াজালে জড়িয়ে ছিল নারীর জীবন। তবে এই শতাব্দীর শুরুতেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কিছু মানুষের, নারীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টায়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরেরা সমাজে নারীদের এই অবস্থান ভাঙতে শুরু করেন। আইন করে রদ হয় সতীদাহ প্রথা, চালু হয় নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি। এই রকমই উদারচেতা মানুষ ছিলেন শ্রী ব্রজকিশোর বসু। তিনি ছিলেন সেই যুগে নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রণেতা। তিনি শিক্ষকতা করতেন। পূর্ববঙ্গের চাঁদশী থেকে ভাগলপুরে আসেন। তার এবং অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে দেশের প্রথম মহিলা সমিতি – "ভাগলপুর মহিলা সমিতি" ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে।ব্রজকিশোর বাবুর ভাগ্নে শ্রী মনমোহন ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ছিলেন এবং তিনিও নারী শিক্ষা প্রসারের পক্ষপাতি ছিলেন। এহেন উন্মুক্ত ও আধুনিক পরিমন্ডল বেষ্টিত পরিবারে জন্ম হয় কাদম্বিনী বসুর ১৮ই জুলাই ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। বাবা ব্রজকিশোর বসু ও পিস্‌তুতো দাদা মনমোহন ঘোষের প্রভাব পড়ে কাদম্বিনীর উপর।

---

১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ ... *এডওয়ার্ড জেনার*

আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স' এবং ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে 'রয়্যাল সুইডিশ একাডেমী অফ আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স' এর ফরেন অনারারি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে জেনার 'জেনারিয়ান সোসাইটির'র সভাপতি নির্বাচিত হন, যেটির মূল উদ্দেশ্য ছিল স্মল পক্স ভ্যাকসিনকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল ভ্যাকসিন এস্টাব্লিসমেন্ট। কিন্তু জেনার ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে তিনি পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৮১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার লন্ডন ফিরে বেশ কিছু স্মল পক্সের রোগীর দেখা পান, যারা আগে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন রোগের তীব্রতা আগের থেকে অনেক কম ছিল। ন্যাচারাল হিস্ট্রির ওপর তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনের শেষ বর্ষে, তিনি তাঁর 'অবসারভেসন অন দা মাইগ্রেসন অফ বার্ড' রয়্যাল সোসাইটিতে পেশ করেন।

জেনারের আবিষ্কারে বিশ্বজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। এমনকি তিনি মারা যাওয়ার পরও চলতে থাকে গবেষণা কার্যক্রম। স্বস্তি পায় মানুষ। তাঁর মৃত্যুর ১৫৭ বছর পর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ঘোষণা করে, গুটিবসন্ত রোগটি শতভাগ নির্মূল সম্ভব হয়েছে। শেষবার এ রোগে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে।

এভাবেই আবিস্কৃত হয় প্রাণঘাতী মারাত্মক ছোঁয়াচে গুটিবসন্ত রোগের টিকা। আর এই আবিষ্কারের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে এডওয়ার্ড জেনারের নাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয় – প্রতিকারের চেয়ে কোনো রোগকে প্রতিরোধ করতে পারাটাই হল সবচেয়ে উত্তম। ডাঃ জেনার আবিস্কৃত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনুসরণ করে গুটিবসন্ত রোগকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিতাড়িত করতে প্রায় ২০০ বছর লেগে যায়। এই সময়কালে বিশ্বে আনুমানিক ৩০ কোটি লোকের মৃত্যু হয় এই মারণব্যাধিতে!!■

তথ্যসূত্র ঃ

১) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200696/

২) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/jenner_edward.shtml

৩) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner

৪) রয়াল সোসাইটি, মেডিসিন দ্বারা প্রকাশিত প্রবন্ধ 'দ্য অরিজিনস্ অফ ভ্যাকসিন ঃ মিথস্ অ্যান্ড রিয়েলিটি' (লেখক ঃ আর্থার বয়েলস্টন)

মনমোহন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাসেরা মিলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২২নং বেনিয়াপুকুর লেনে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বোর্ডিং স্কুল চালু করেন। এর জন্য তাঁরা মিসেস্ অ্যানেট অ্যাক্রয়েড নামক এক বিদেশিনীকে নিয়ে আসেন শিক্ষকতা করার জন্য। ১৩ বছর বয়সে কাদম্বিনী কলকাতায় এসে এই স্কুলে ভর্তি হন। যদিও আড়াই বছরের মাথায় এই স্কুল উঠে যায়। ফের ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে স্কুলটি পুনরুজ্জীবিত হয়। পরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্যালয়কে মিশিয়ে নেওয়া হয় বেথুন স্কুলের সাথে। কাদম্বিনী ছিলেন এই স্কুল থেকে প্রথম এন্ট্রান্স বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসা মেয়ে। মাত্র ১ নম্বরের জন্য তিনি প্রথম বিভাগ পাননি। লর্ড লিটন তার স্ত্রীর হাত দিয়ে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন। সেই সময়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' একটি প্রশ্ন ওঠে – "কাদম্বিনী এখানে কোন্ কলেজে পড়িবেন?" কাদম্বিনী প্রথমে আর্টস নিয়ে পড়তে চান। বেথুন স্কুল কমিটি ১৮৭৮ ও ৭৯ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনীর জন্য এই স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করে। একজন ছাত্রী ও একজন লেকচারার নিয়ে চালু হয় এই কলেজ। পরে অবলা, সরলা দাস প্রমুখেরা যুক্ত হন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী ডাক্তারি পড়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজ কাউন্সিল কোন হেলদোল দেখায়নি। অগত্যা তিনি বি.এ পড়ায় মনোযোগ দেন।

এদিকে কাদম্বিনীর শিক্ষাগ্রহণের লড়াই যখন চলছিল, তখন দেরাদুনে আর এক মহিলা চন্দ্রমুখী বসু মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে কোলকাতায় বেথুন স্কুলে ভর্তি হতে আসেন। তখন তাঁর বাবা খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মালম্বিত ছিলেন বলে তাকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। তিনি পুনরায় দেরাদুনে ফিরে গিয়ে এফ.এ. পরীক্ষা দেন সফলভাবে। আই. এ. পরীক্ষা দেবার অনুমতি চেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দেন। চিঠিটি শোরগোল ফেলে দেয়। অনেক টালবাহানার পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু পরীক্ষা দেন। ইংরাজী, ল্যাটিন, লজিক প্রতিটি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তবুও উত্তীর্ণের তালিকায় তাঁর নাম বাদ পড়ে নিয়মের ফাঁকে পরে। পরীক্ষার্থীদের তালিকায় 'অল পার্সনস্' বলে উল্লেখ ছিল। ওদিকে কাদম্বিনী, অবলা, সরলা দাস প্রমুখের অনেকদিনের প্রতিবাদ, আন্দোলনের ফলে মহিলা পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের পরীক্ষা সম্পর্কে বদলায় বিজ্ঞপ্তির ধরণ। হয় – অল পার্সনস্ অ্যান্ড উইমেন আর অ্যালাউড ..."। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সাফল্যের সাথে মহিলা গ্র্যাজুয়েট হন কাদম্বিনী। তখন চন্দ্রমুখী আবার আবেদন করেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়। তাঁকেও মহিলা গ্র্যাজুয়েট ঘোষণা করা হয়। অনেকদিন পর অধ্যাপিকা সুনন্দা ঘোষ, বহু নথিপত্র ঘেঁটে চন্দ্রমুখী বসুকে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটের সম্মান ফিরিয়ে দেবার জন্য আবেদন করেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মরোনোত্তর প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট স্বীকৃতি পান চন্দ্রমুখী। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো চন্দ্রমুখী এম. এ. পড়েন এবং তিনি হন ভারতের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম এম. এ. উত্তীর্ণা নারী। তিনি বেথুন স্কুলে প্রথমে শিক্ষকতা করেন এবং পরে প্রিন্সিপাল হন।

যাইহোক আবার ফিরে আসি কাদম্বিনী প্রসঙ্গে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে গ্র্যাজুয়েট হবার পর ৪ঠা জুন কাদম্বিনী আবার আবেদন করেন মেডিকেল কলেজ কাউন্সিলে। ১২ই জুন তাঁর সাথে বিয়ে হয় তার একদা শিক্ষক, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। দ্বারকানাথ আমৃত্যু তাঁর স্ত্রীর পাশে থাকেন এবং স্ত্রীকে অনুপ্রাণীত করেন। মেডিকেল কলেজ কাদম্বিনীর আবেদন এবার মঞ্জুর করে। ঐ জুন মাসের শেষেই তিনি ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। শুরু হয় আর এক নতুন অধ্যায়, নতুন দ্বন্দ্ব।

যদিও তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, তবুও তাঁর চলার পথ মোটেই মসৃন ছিল না। ঐ কলেজেরই শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাক্তার রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র। তিনি আবার বিলেতের লর্ড পরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রকাশ্যেই কাদম্বিনীকে নানা ভাবে অপদস্ত করতেন। এবং মেডিকেল বিভাগে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়ে দেন। ব্যাচেলার অব মেডিসিন অর্থাৎ এম. বি. পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি কাদম্বিনী। চিকিৎসক জে. এম. কোটস্ তখন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মেডিসিন বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ও চিকিৎসক। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কাদম্বিনীর সাথে অন্যায় হচ্ছে। তাই তিনি সিন্ডিকেট-এ আলোচনা করে কাদম্বিনীকে এল.এম. এস. অর্থাৎ 'লাইসেনসিয়েট ইন মেডিসিন এ্যান্ড সার্জারি' সার্টিফিকেট দেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এরপর দু'বছর এলএমএস পড়ার পর ফাইনালে রাজেন্দ্র চন্দ্র আবারও তাকে নিজের বিষয়ে ফেল করান। তখন অধ্যক্ষ জে. এম কোটস্ নিজের অধিকার বলে 'গ্র্যাজুয়েট অব দা মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল' বা জিএমসিবি উপাধি দেন। ফলে ডাক্তার হয়ে প্র্যাক্টিসের ছাড়পত্র পেয়ে যান কাদম্বিনী। দেশে-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। খোদ ফ্লরেন্সা নাইটিঙ্গল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "ভারতের মতো গোড়াঁ

দেশের একটি মেয়ে বিয়ের পর ডাক্তারি পড়ছে এবং একটি বা দুটি সন্তানের জন্মের সময়েও মাত্র তেরো দিন কলেজ কামাই করছে এবং সম্ভবত একটি লেকচারও মিস করেনি।"

যখন কাদম্বিনী মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ছেন তখন ভারতেরই আর এক প্রান্তে মহারাষ্ট্রের আর একটি মেয়ে আনন্দিবাঈ গোপাল জোসি ডাক্তারি পড়ার জন্য আমেরিকা পাড়ি দেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার 'উইমেন্স মেডিকেল কলেজ অফ পেনসিলভেনিয়া' থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'ডক্টর অব মেডিসিন' পাস করেন। তাই ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার শুধু কাদম্বিনী নন্ আনন্দবাঈ-কেও বলা হয়। আনন্দিবাঈয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর সাথী প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। আনন্দিবাঈ, কাদম্বিনী যে সময়ে ডাক্তারি পড়ছিলেন তখন শুধু দেশে নয় বিদেশেও মহিলাদের ডাক্তারি পড়া নিয়ে বিরোধিতা ছিল প্রবল। বিদেশেও তখন মেয়েদের ডাক্তারি পড়া আটকাতে কিছু অধ্যাপক ক্লাসে নির্লজ্জ ভাবে মানব দেহের ডেমনস্ট্রেশন দিতেন। টিটকারি তো ছিলই। তবুও কোন বাধা এই দুই মহিলাকে দমাতে পারেনি। ডাক্তারি ডিগ্রির পর আনন্দিবাঈ দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে টিবি রোগে মৃত্যু হয় তাঁর। এইভাবে জীবনাবসান হল এক অত্যন্ত লড়াকু প্রতিভাময়ীর।

জি. এম. সি. বি. র পর অধ্যাপক কোটস্ কাদম্বিনীকে ইডেন হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ করে দেন। কিন্তু ডাক্তারির এম. বি ডিগ্রি না থাকায় তাকে নার্সের মর্যাদা দেওয়া হতো। রোগ নির্ণয় বা অস্ত্রোপচার করতে দেওয়া হতো না। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে তিনশ টাকার বেতনে কাজে যুক্ত হন তিনি। কিন্তু সেখানেও অবস্থা একই রকম ছিল। বিদেশী ডাক্তাররা বিদ্রুপ করতেন তাকে। তিনি তখন খবরের কাগজে রীতিমতো নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্ শুরু করেন।

কাদম্বিনী যে শুধু তাঁর প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্ নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন, এরকমটা নয়। ডাক্তারি ডিগ্রি না থাকাটা তাকে কাঁটার মতো বিধছিল। নারী-শিক্ষার বিরোধীরা নানা রকমভাবে তার বিরোধিতা করতো। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা গোষ্ঠী তাকে 'চরিত্রহীনা' বলে। এর বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী আদালতে মামলা করেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের একশ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের জেল হয়। ইতিমধ্যে কাদম্বিনী আট সন্তানের জননী হয়ে যান। তিনি তখন ঠিক করেন বিলেতে গিয়ে ডিগ্রি নেবেন। বিদেশে যাবার টাকার সংস্থান করা, বিদেশে থাকার ব্যবস্থা এছাড়া আট সন্তানের দেখাশোনার ব্যবস্থা করেন তিনি। এই ব্যাপারে তাঁর স্বামী ও পরিবারের বিশেষ সহযোগিতা পান। দ্বারকানাথের প্রথম পক্ষের মেয়ে বিধুমুখী ও তার স্বামী উপেন্দ্রকিশোর আট সন্তানের দায়িত্ব নিলেন। সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স ছিল মাত্র দেড় বছর। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলেত যাত্রা করেন। তিনটি ডিপ্লোমা যথা – এল আর সি পি (এডিনবার্গ), এল আর সি এস্ (গ্লাসগো) ও জিএফপিএস্ (ডাবিন) অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন তিন মাস পরে। 'বামাবোধিনী' 'ইন্ডিয়ান ম্যাসেঞ্জার' ইত্যাদি পত্রিকায় তার তুমুল প্রশংসা করে। এরপর তিনি কিছুদিন লেডি ডাফরিন কলেজে কাজ করে আবারও প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্ শুরু করেন।

কাদম্বিনী যে শুধু মাত্র ডাক্তারি করতেন তা নয়, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত রাখতেন ও বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে ৬ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন, কাদম্বিনী তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রথম মহিলা বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। স্বামী দ্বারকানাথ মহিলা শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করতেন। চা বাগানের শ্রমিকদের শোষণের বিরুদ্ধে সরব থাকতেন। কাদম্বিনীও তার স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করতেন এবং আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পদ্ধতিকে নিন্দা করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ বয়কট আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করেন।

তবে সব কিছুর ওপর ছিলেন চিকিৎসক কাদম্বিনী। তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ-এর যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন বিকালে কলকাতার এক জমিদার বাড়ি থেকে প্রসব করানোর জন্য কাদম্বিনীকে কল দেওয়া হল। সকলকে হতবাক্ করে ব্যাগপত্র নিয়ে তিনি রওনা হন। অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে বলেন – "যে গেছে সে তো আর ফিরবে না, যে নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আসছে তাকে তো আনতে হবে।"

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর – হাসপাতালে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এক জটিল অস্ত্রপচার করে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করেন এবং বিছানায় শুয়ে পড়েন। হার্ট অ্যাটাক হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যান। শেষ হয় ব্যতিক্রমী এক পথ প্রদর্শকের জীবন। তবু বহু মানুষকে অনুপ্রেরণাদানকারী হয়ে তিনি অমর হয়ে রয়ে গেলেন।■

তথ্যসূত্র ঃ
(১) উইকিপিডিয়া, ইন্টারনেট (২) পারিজাত বন্দোপাধ্যায়ের নিবন্ধ (৩) আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ঈশা দাশগুপ্তর নিবন্ধ।

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(সপ্তম পর্ব)

গণিত বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বীজগণিতের সঙ্গে জ্যামিতির সম্বন্ধ তৈরির বিষয়ে বিগত অধ্যায়গুলিতে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু একে সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন ইউরোপে আধুনিক মনন থেকে রেনে দেকার্তে এবং পিয়ের ডে ফার্মা নামক দুইজন ফরাসী দার্শনিক। সময়কালটা ১৫শ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ১৬শ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকাল পর্যন্ত। বিগত দুটি পর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তন এক সমন্বিতরূপ পেল এঁদের কাজকর্মে।

বিগত পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম যে আলখোয়ারিজমির বীজগণিত যা ল্যাটিনে অনুদিত হয়ে ইউরোপকে গণিতের এই নতুন শাখা সম্পর্কে অবহিত করেছিল, তা তখনও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। ফলে বীজগণিত তখনও ছিল কতগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির সেট যা নির্দিষ্ট কোনো সমীকরণের সমাধান দিতে সক্ষম ছিল মাত্র। তখনও সমীকরণের খুব সামান্য সাধারণীকরণ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ $3x^2+5x+7=0$ এমন সমীকরণের প্রকাশ সম্ভব ছিল। কিন্তু আরো সাধারণরূপ, যেমন $ax^2+bx+c=0$ (যেখানে a, b, c ধ্রুবক এবং x চলরাশি) – এমন আধুনিক সাধারণ সমীকরণের (generalised equation) প্রকাশ হয়নি। আমরা একথা বলছি অবশ্যই ইউরোপের সাপেক্ষে। কারণ বিগত পর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে এমন সাধারণ সমীকরণের সমাধান ভারতে বহুপূর্বে এসে গেছিল।

এবিষয় চর্চা ইউরোপে মূলত ফ্রান্সে হয়েছিল। ফ্রাঙ্কোইস ভিয়েতে (Francois Viete) নামক এক ফরাসী আইনজ্ঞ এ বিষয়ে প্রথম ভূমিকা রাখা শুরু করেন। তিনি চলরাশি-র স্থলে স্বরবর্ণ (Vowel) এর ব্যবহার এবং ধ্রুবক (Constant)-র স্থলে ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) ব্যবহার করা চালু করেন। উদাহরণস্বরূপ $A^2+BA=C$ এই দ্বিঘাত সমীকরণ (এখানে C, B ধ্রুবক এবং A চলরাশি)। যদিও ভিয়েতের এই নোটেশন গণিতমহলে সামান্যই গৃহিত হয়।

এরপর আসেন রেনে দেকার্তে এবং পিয়ের ডে ফার্মা। এঁরা দুজনেই স্বতন্ত্রভাবে বীজগণিতের আধুনিকীকরণ ঘটান। এঁরা দুজনেই বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যকার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দর্শনের জগতে দেকার্তে পরিচিত ছিলেন দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে। এই দ্বৈতবাদ আসলে ভাববাদ। তিনি বলতেন যে দুই ধরনের বাস্তবতা রয়েছে জগতে। একটি চিন্তা বা মন, অন্যটি বস্তু। মন পুরোপুরি সচেতন এবং স্থানগত দিক দিয়ে কোনো জায়গা দখল করে না। অন্যদিকে বস্তু জায়গা দখল করে এবং একে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা চলে। তাঁর মতে এই দুই বাস্তবতাই ঈশ্বরের থেকে এসেছে, যদিও এই দুই সারবস্তুর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এই হল দেকার্তের দ্বৈতবাদ। তিনি চেতনার উৎস বস্তু এই কথা মনে করতেন না বলেই বস্তুবাদী নন, ভাববাদী ছিলেন।

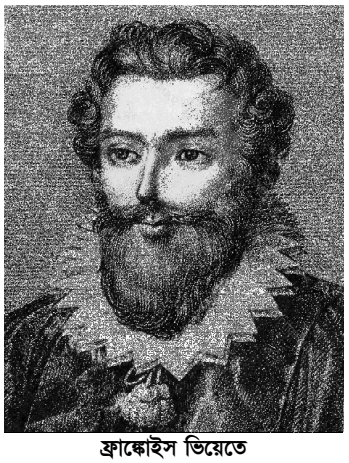

ফ্রাঙ্কোইস ভিয়েতে

ভাববাদী দেকার্তের দর্শন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করত। তাঁর দার্শনিক সমস্যা সমাধানের একটি প্রস্তাবিত পদ্ধতি ছিল। তাঁর মতানুযায়ী কোনো কিছুকে পরিষ্কারভাবে এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত আমরা সেটাকে সত্য বলে ধরে নিতে

পারি না। সেজন্য, কোনো জটিল সমস্যাকে যতগুলো সম্ভব একক সমস্যায় ভেঙে নেয়া বা ছোট করে নেয়া দরকার। তখন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ ভাব থেকে আমরা চিন্তা শুরু করতে পারি।

এই দর্শন আমরা পাই ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত পুস্তকে 'Discours de la methode pour bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences (ইংরাজীতে ডিসকোর্স অন দ্য মেথড অফ রিসনিং ওয়েল অ্যান্ড সিকিং ট্রুথ ইন দ্য সাইন্সেস)। এই পুস্তকের শেষাংশে ছিল 'লা জিওমেট্রি' অধ্যায়। এখানেই বর্ণিত হয়েছে জ্যামিতি ও বীজগণিতের আন্ত -র্সম্পর্কের কথা। এই আন্তর্সম্পর্কের বিষয়ে বিগত অধ্যায়ে আলোচনা হয়ে গেছে। এটা ইউরোপের গণিতের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিল। ইউরোপে নবজাগরণের সাথে সাথে বীজগণিতও বিকশিত হচ্ছিল, যা দেকার্তের 'লা জিওমেট্রি'-তে এসে এক চূড়ান্তরূপ পেল।

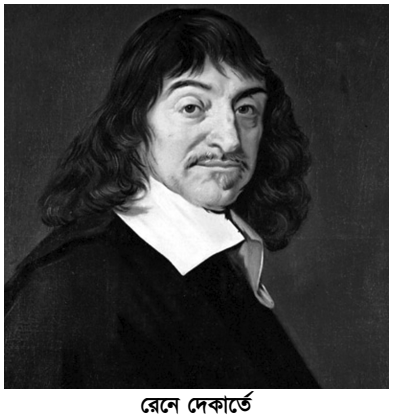
রেনে দেকার্তে

দেকার্তে এই পুস্তক রচনা করেছিলেন ইউরোপের অপেক্ষাকৃত মুক্ত চিন্তার দেশ হল্যান্ডে। যদিও সেখানকার মুক্ত পরিবেশ তাঁর জন্য বেশিদিন অনুকূল থাকল না। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর পুস্তক ছাপানো নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হল এবং তাঁকে নাস্তিক (atheist) বলে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেও হয়েছিল।

দেকার্তের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, দর্শনে এবং বিশেষ করে এর প্রভাবাধীন গণিতের জগতে যে নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন, তার প্রভাব থেকে গেছে আরো একশো বছর।

বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতি (Analytic geometry) কে সাধারণভাবে দেকার্তের উদ্ভাবন বলেই প্রচারিত হলেও এবিষয়ে পিয়ের ডে ফার্মা (Pierre De Fermat) এর অবদান সমানভাবে রয়েছে। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ দেকার্তের ঐ বইটি প্রকাশের আটবছর আগে) তিনি অ্যাপোল্লোনিয়াসের কনিক সেকশনকে প্রসঙ্গ করে ইউরোপের গণিতের জগতে যে কাজ করেছিলেন, ইতিহাসের বিচারে তা দেকার্তকে পিছনে ফেলে দেয়। কিন্তু ফার্মা তাঁর পুস্তক ছাপাতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর, পুস্তক রচনার পঞ্চাশ বছর পর এটা প্রকাশিত হয়। যেহেতু উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে একই কাজ করেছেন, তাই গণিতের ইতিহাসে এঁদের দুজনকেই বীজগণিতের আধুনিকরূপ ও জ্যামিতির সঙ্গে সম্বন্ধ সম্পর্কে প্রায় পুর্ণাঙ্গ দৃষ্টিদানকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

পিয়ের ডে ফার্মা

আমরা গণিত বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় সেই বিষয়গুলোকেই জোড় দিচ্ছি, যেগুলোর সম্মিলিত প্রভাব নিউটনকে ত্বাড়িত করেছে ক্যালকুলাস আবিষ্কারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে গণিতের নতুন শাখা ক্যালকুলাসের আবিষ্কর্তা একা নিউটন নন, জার্মান গণিতজ্ঞ উইলহেলম্ লিবনিজ-ও স্বতন্ত্রভাবে এই কাজ করেছেন। নিউটনের এই আবিষ্কার ও তার ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগ, গণিতকে সেই যুগে এমন একটা শক্তপোক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যে তার সাহায্যে তৎকালীন পদার্থবিজ্ঞান একটা নতুন অস্ত্র পেল। এখানেই নিউটন অন্য বিগত বিজ্ঞানীদের থেকে বিশেষ অবস্থানে চলে আসলেন।

যে চারটি সমস্যা ক্যালকুলাস নামক গণিতের শাখাকে জন্ম দিয়েছিল, সেগুলি যথাক্রমে –

১) যেকোনো আকারের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও তার সঙ্গে বলা যায় যেকোনো আকারের ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করার সমস্যা।

২) গতিশীল বস্তুর গড় দ্রুতির পাশাপাশি তার যেকোনো মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দ্রুতি নির্ণয় করতে না পারার সমস্যা।

একই সঙ্গে কোনো বক্ররেখার উপরিস্থিত যেকোনো বিন্দুতে

অঙ্কিত স্পর্শকের নতি (slope) নির্ণয়ের সমস্যা।

– এই দুটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কিত। কারণ ধরি একটি গতিশীল বস্তু ঐরকম কোনো বক্রপথে সঞ্চরণশীল। এমতাবস্থায় যদি ধরে নেওয়া যায় যে গতিশীল বস্তুটির একক সময় অতিক্রান্ত দূরত্বের মান (magnitude) স্থির। তবু প্রতি মুহূর্তে তার বেগের পরিবর্তন হয়ে চলবে, কারণ বক্ররেখার উপরস্থ প্রতিটি বিন্দুতে কোনো রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখ দেখাবে। এই অভিমুখদর্শী প্রতিটি সরল রেখা হল, সে বিন্দুতে আঁকা বক্ররেখার স্পর্শক। এই স্পর্শকের নতি-ই তো প্রতি ক্ষেত্রে গতিশীল বস্তুর গতিমুখ দর্শাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মূহূর্তে তার তাৎক্ষণিক বেগ-কে বোঝাবে।

আবার যদি গতিশীল বস্তুর গতিমুখ না বদলালেও তার দ্রুতির পরিবর্তন হয়ে চলেছে, (যেমন অবাধে পতনশীল বস্তু), তার ক্ষেত্রেও কোনো এক মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দ্রুতির সাপেক্ষ বক্ররেখা সময় ও দূরত্বের (অতিক্রান্ত) রেফারেন্স ফ্রেমের সাপেক্ষে অঙ্কন করে যে মুহূর্তে তাৎক্ষণিক দ্রুতি মাপা হবে, সেই মুহূর্তের সাপেক্ষ বক্ররেখার উপরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের নতি নির্ণয় করে তাকে মাপা যাবে। তাই এই দুটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কিত। কারণ লেখচিত্রের বক্ররেখা সর্বদা শুধু ঐ বক্ররেখাকেই প্রকাশ করে এমন নয়। যেমন বীজগণিতের সমীকরণ অসংখ্য বস্তুজগতের ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। সেখানে একটি স্বাধীন চলরাশির পরিবর্তনে কোন একটা কাজ (function) থেকে প্রাপ্ত চলরাশিকে আমরা বলি নির্ভরশীল চলরাশি (dependent varialbe)।

৩) অভিকর্ষের টানে পতনশীল বস্তুর গতি

– এই সমস্যাটা বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ভব হলেও আগের বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আলোচনা করা হবে আগের বিন্দুতে।

৪) কামান থেকে ছোঁড়া গোলাকে কিভাবে ছুঁড়লে নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে আঘাত করবে।

বোঝাই যাচ্ছে যে সমস্যাগুলো সবকটাই মানব সমাজের জীবনের বাস্তব সমস্যা। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরেই মানুষ ভাবনা-চিন্তা করেছে। বহুমানুষের (দার্শনিকের) চিন্তার সম্মিলিতরূপে ক্যালকুলাসের আগমন হয়।

প্রথম সমস্যা ঃ যে কোনো আকারের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও বস্তুর আয়তন নির্ণয় (find the area and volume of any shape)

আমরা পঞ্চম পর্বে দেখিয়েছিলাম দার্শনিক ইউডক্সাস থেকে আর্কিমিডিস পর্যন্ত অর্ধবৃত্ত ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রতি ক্ষেত্রেই পুরো ক্ষেত্রটিকে অসংখ্য ত্রিভূজে বিভক্ত করে, প্রতিটি ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে, তার সমষ্ঠি নির্ণয়ের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের চেষ্টা থেকেছে। কিন্তু তা অল্প হলেও ত্রুটি সম্পন্ন ছিল। এই অসফলতাই গণিতজ্ঞদের ভাবিয়েছে কীভাবে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়। এই প্রচেষ্টা চলেছে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগ পর্যন্ত অবশেষে জোর্তিবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ জোহান কেপলার আর্কিমিডিসের পদ্ধতিকে ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করলেন।

এটা পরীক্ষা করেই দেখা গেছে যে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ (যা ব্যাসের অর্ধেক) যা, তার 2π গুণিতক মান হল বৃত্তের পরিসীমা। যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হয়, তবে তার পরিসীমা (বৃত্তটিকে একচক্কর প্রদক্ষিণ করতে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়) $= 2\pi . r$

এভাবে কোন বৃত্তের কেন্দ্রকে শীর্ষবিন্দু ধরে অসংখ্য ত্রিভূজে বিভক্ত করে ফেলা যায় (চিত্র-১)। আপনারা চিত্রটি দেখে এই প্রশ্নটা অবধারিতভাবে করবেন যে এক্ষেত্রে প্রতিটা ত্রিভূজের ভূমি কী সরলরেখা? কিন্তু যদি এই ত্রিভূজগুলির সংখ্যা অসংখ্য হয়, যে সংখ্যক ত্রিভূজ এই চিত্রে দেখানো যায়নি, যাবেও না, তবে সেই **সীমাহীন ক্ষুদ্র প্রতিটি ত্রিভূজের ভূমি সরলরেখ হবে।** সেক্ষেত্রে ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল

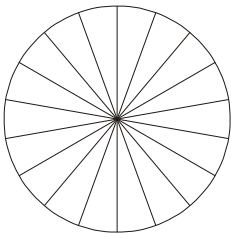

(চিত্র - ১)

= প্রথম ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল+দ্বিতীয় ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল+ ...

= ($\frac{1}{2}$ × প্রথম ত্রিভূজের ভূমি × উচ্চতা) + ($\frac{1}{2}$ × দ্বিতীয় ত্রিভূজের ভূমি × উচ্চতা) + ...

= $\frac{1}{2}$ × উচ্চতা (প্রথম ত্রিভূজের ভূমি + দ্বিতীয় ত্রিভূজের ভূমি + ...)

= $\frac{1}{2}.r.$ (বৃত্তের পরিসীমা)

= $\frac{1}{2}.r.(2\pi r) = \pi r^2$

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে সীমাহীন ক্ষুদ্র অসংখ্য ত্রিভূজে বিভক্ত করে এই সসীম ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্ভব হল। তখনও পর্যন্ত এরকমই মনে হয়েছে। যদিও মনে রাখার বিষয় এই যে π এর পূর্ণমান নির্ণয় সম্ভব না হওয়ায় বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সসীম পূর্ণ মান নির্ণয়ও সম্ভব নয়। তবু ইউডক্সাস থেকে আর্কিমিডিস হয়ে কেপলার বক্ররেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো ক্ষেত্রের অনেকটাই সঠিক ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন। কেপলারের এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তার কুড়ি বছর পর গ্যালিলিওর এক ছাত্র বোনাভেনচারা ক্যাভালিয়েরি একটি জনপ্রিয় পুস্তক রচনা করেন।

ক্যাভালিয়েরি এই বইতে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক বস্তুর যথাক্রমে ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করে দেখান। তাঁর নীতি (Principle) অনুযায়ী –

১) দুটি দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রের যদি উচ্চতা সমান, বেধ (width) যে কোন সমান উচ্চতায় সমান/ধ্রুবক থাকে, তবে তাদের ক্ষেত্রফল সমান।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

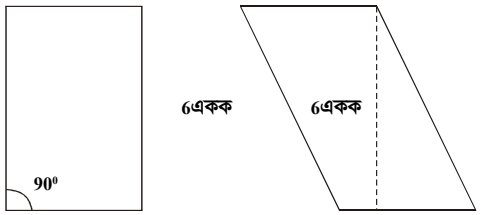

4একক 4একক

আয়তক্ষেত্র (A) সামন্তরিক (B)

(চিত্র - ২)

ক্যাভালিয়েরির বক্তব্য অনুসারে আয়তক্ষেত্র (A) এর ক্ষেত্রফল = সামন্তরিক (B) এর ক্ষেত্রফল। এমন উদাহরণ ত্রিভূজ বা অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ক্যাডেলিয়েরির এই নীতি অনুযায়ী যেকোনো দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র অসংখ্য আয়তক্ষেত্রের সমষ্টি, যে আয়তক্ষেত্রগুলি এতটাই পাতলা যে এক একটি রেখায় পর্যবসিত হচ্ছে। অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফল শূন্য না হলেও শূন্যের সবথেকে নিকটতম, যতটা নিকটতম কল্পনা করা যায়।

২) দুটি ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রের যদি উচ্চতা সমান হয়, এবং সমান প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (cross sectional area) যেকোনো সমান উচ্চতায় সমান থাকে, তবে তাদের আয়তন সমান।

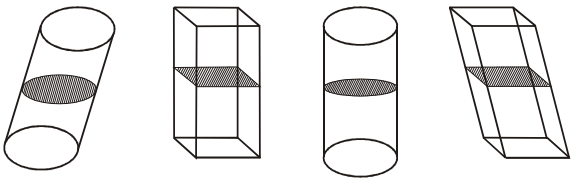

A_1 বস্তু B_1 বস্তু C_1 বস্তু D_1 বস্তু

(চিত্র - ৩)

মনে রাখার বিষয় এই যে ইতিমধ্যে আর্কিমিডিসের দ্বারা প্রবাহীতে নিমজ্জিত বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়ে গেছে।

A_1, B_1, G_1, D_1 বস্তুগুলির একই উচ্চতায় প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (যা ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলি দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে ছবিতে) সমান।

ক্যাভালিয়েরি এই উদাহরণে যে ক্ষেত্রফলগুলি (প্রস্থচ্ছেদের-র কথা বলেছেন, তাদেরকেও এক একটা আয়তঘন ভাবা যায়, যেগুলি এতটাই পাতলা যে এক একটি আয়তঘনের উচ্চতা শূন্য না হলেও শূন্যের সবথেকে নিকটতম, যতটা নিকটতম কল্পনা করা যায়।

বোঝাই যাচ্ছে ক্যালকুলাসের 'লিমিট' ধারণার সূত্রপাত হয়ে গেল। (ক্রমশ)

করোনা বিশ্বমহামারির দিনলিপি

জুলাই ২০২০

৩১. ●ইউনিয়ন স্বাস্থ্য মন্ত্রী হর্ষবর্ধন বলেছেন – ভারতে কোভিড আক্রান্তে ০.২৮ শতাংশকে ভেন্টিলেশনে, ১.৬ শতাংশকে আইসিইউ-তে, ২.৩২ শতাংশকে অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হচ্চে।●ভিয়েতনামে প্রথম কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর খবর।

অগাস্ট ২০২০

১. ●কোভিড সংক্রমে মৃত্যু সম্পর্কে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জে.ই বলসেনারো বলেন, ঃ 'কত লোকই তো রোজ রোজ মরে'।

৩. ●আসামে লকডাউন পরীক্ষামূলকভাবে তুলে নেওয়ার কাজ শুরু।●রাজ্যে সংক্রমণ সাড়ে চার লক্ষ ছাড়ালো।

৪. ●মুম্বাই-এর সমস্ত দোকান খুলে দেওয়া হল।●বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌময়া স্বামিনাথন বলেছেন যে বাস্তবসম্মত কোভিড ভ্যাকসিন প্রথম সর্বজনীন স্তরে ২০২১ এর মাঝামাঝির আগে পৌঁছবে না। এ মুহূর্তে ২৭টির মত ভ্যাকসিন ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্য অপেক্ষমান এবং আরো দেড়শোটি প্রি-ক্লিনিকাল পরীক্ষার স্তরে রয়েছে।●কোভিড সংক্রমণের ৮২ শতাংশ দেশের ১০টি রাজ্যের এবং ৬৬ শতাংশ দেশের ৫০টি জেলার।●ভারতে আরটিপিসিআর এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট মিলিয়ে ২ কোটির অধিক টেস্ট হয়েছে। (১৪০টি টেস্ট প্রতিদিনে প্রতি দশ লক্ষে হয়েছে)●রাষ্ট্রসংঘ জানালো বিশ্বমহামারির কারণে বিশ্বের ২ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু ইস্কুল থেকে ড্রপ আউট হবে।

৬. ●ভারতে কোভিড সংক্রমণ ২০ লক্ষ ছাড়ালো। ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ সংক্রমণে লেগেছে মাত্র ২১ দিন। প্রথম দশ লক্ষ সংক্রমণে লেগেছে ১৬৮ দিন।●সংক্রমণে মৃত্যু ৪১,৬৪১ জনের। ১৬ই জুলাই পর্যন্ত তা ছিল ২৫, ৫৯৯।●বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গেল আহমেদাবাদের কোভিড হাসপাতালের একাংশ। চিরাগ প্যাটেল নামক যুবক প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ৩ জনকে বাঁচালেন।

৭. ●কয়েকমাস আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এক লাখের আশাপাশে করোনায় মৃত্যু থাকবে।" আজ একদল বিশেষজ্ঞ তাঁদের রিপোর্টে দাবি করলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্পের বেপরোয়া পথ অনুসরণ করলে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

৮. ●'ভ্যাকসিন ন্যাশনালিজম' বা 'টিকা জাতীয়তাবাদ'-এর বিরুদ্ধে সরব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌময়া স্বামিনাথন বললেন যে 'টিকা জাতীয়তাবাদ' এর নাম করে বহুদেশ শুধু নিজের দেশের নাগরিকদের কথাই ভাবছে। ভাইরাস সারা বিশ্বের ছড়িয়ে আছে এবং কিছু নির্দিষ্ট পকেটের মানুষেরই যদি টিকাকরণ হয়, তবে বিশ্ব স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে পারবে না এবং অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না।

৯. ●সংক্রমণে দেশে দৈনিক মৃত্যু ১০০০ জন ছাড়ালো।

১০. ●একদিনে রাজ্যে চার চিকিৎসকের মৃত্যু হল। এ পর্যন্ত রাজ্যে অন্তত ২০ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে।●করোনা সংক্রমণ এড়াতে সুরক্ষাকবচ (প্রোফাইল অ্যাক্সিস) হিসেবে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ব্যবহারে কার্যত ঐক্যমত হল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

১১. ●বিশ্বে করোনা ভাইরাসের প্রথম ভ্যাকসিন আনল রাশিয়া, নাম স্পুটনিক ভি। অক্সফোর্ডের চ্যাডক্স-১ এর মতোই সাধারণ সর্দিকাশির জন্য দায়ী ভাইরাসকে জিনগতভাবে বদলে, দুর্বল করে তৈরি করা হয়েছে এই 'ক্যান্ডিডেট'।●সংবাদে প্রকাশ – আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই টিকা আনছে সিরাম ইনস্টিটিউট। আপাতত এই টিকার 'বিশেষ মূল্য' হবে ২২৫ টাকার কাছাকাছি।●করোনা যুদ্ধে দেশের এ পর্যন্ত দুশোর কাছাকাছি চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী সংক্রমিত হয়ে মারা গেছেন।●কলকাতার ডিসান হাসপাতাল কোভিড রোগী লায়লা বিবিকে অগ্রিম ২ লক্ষ টাকা না দিতে পারায় তাঁর মৃত্যু হয়।●লকডাউনের ফলে কাজ হারিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে মানুষের যাতায়াত বাড়ায় গত ৪ মাসে ১০ জন বাঘের আক্রমণের মুখে পড়লেন। ৫ জন মৃত্যু এবং ৫ জন নিখোঁজ।●মৃত কোভিড যোদ্ধাদের নিকট আত্মীয়কে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল রাজ্য সরকার।

১৩. ●রুশ জ্যাকসিন 'স্পুটনিক ভি' ভ্যাকসিনকে ট্রায়াল না করেই বাজারে আনার অভিযোগ উঠল।

১৬. ●ভারতে করোনা সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারে পৌঁছাতে সময় লাগল ১৫৬ দিন।

১৭. ●দেশে লকডাউনের ফলে গ্রামে ফেরা প্রবাসী শ্রমিকদের ১২ শতাংশেরও কাজের চাহিদা মেটানো যায়নি।

১৮. ●সব এগোলে আগামীকালই সম্ভবত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টিকার ৩য় তথা শেষ দফার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হতে চলেছে । রাশিয়ার 'স্পুটনিক ভি' টিকা পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভারতসহ বিশ্বের কমপক্ষে ২০টি দেশ।

১৯. ●কোভিড চিকিৎসায় বেসরকারি সংস্থাগুলির বেলাগাম মুনাফা কামানো এবং অর্থ জমা দিতে না পারায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা রাজ্য সরকার স্বীকার করলেও কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ।●বিশ্বব্যাঙ্ক জানালো করোনার আগে থেকেই ধুঁকছিল ভারতীয় অর্থনীতি।

২২. ●সারাদেশে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ লক্ষে

পৌঁছালো, মৃত ৫৬,৯৭৪ জন।

২৩. ●দেশে করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখীতার পাশাপাশি সুস্থ হওয়ার হারও ঊর্ধ্বমুখী।

২৪. ●বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৭২টি দেশকে নিয়ে একটি করোনা ভ্যাকসিন সংক্রান্ত চুক্তি করতে চায়, যার নাম 'কোভ্যাক্স'। প্রতিষেধক আবিষ্কার হলে এইসব দেশ তা ব্যবহারের সমান অধিকার পাবে এবং তার জন্য অর্থসাহায্য করতে হবে। আগামী ৩১শে অগাস্টের মধ্যে আগ্রহী দেশগুলির আবেদন জানাতে হবে আর ৯ই অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক বকেয়া মেটাতে হবে।

৩০. ●২১শে সেপ্টেম্বর থেকে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা, খেলাধূলা ও অন্যান্য বিনোদনে সর্বাধিক ১০০ জনের জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হল।●সমগ্র বিশ্বে করোনা সংক্রমণ আড়াই কোটি ছাড়াল, শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ আমেরিকার ৫টি দেশ প্রথম দশের তারিকায়।

সেপ্টেম্বর ২০২০

১০. ●আজ ব্রিটেনে প্রতিষেধক নেওয়ার পর এক স্বেচ্ছাসেবক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঐ দেশে অ্যাসট্রোজেনেফা পরীক্ষা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হল।●করোনা ভাইরাস মস্তিষ্কে বাসা বাঁধতে সক্ষম বলে ধারণা করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজিস্ট আকিকো ইওয়াসকি।

১১. ●সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল কোভিড রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স এর ভাড়া যুক্তিসঙ্গতভাবে বেঁধে দিতে হবে।

১২. ●এই মুহূর্তে বিশ্বে ১৭০টির মতো কোভিড ভ্যাকসিন ট্রায়াল চলছে।

১৩. ●চিনের উহান ল্যাবেই নভেল করোনা ভাইরাস সার্স কোভ-২ এর জন্ম এবং এই সংক্রান্ত সব তথ্যপ্রমাণ তাঁর কাছে আছে বলে বোমা ফাটালেন চিনা ভাইরোলজিস্ট (হংকং-এ গবেষণারত) লিং মেং ইয়ান। তিনি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন "এই ভাইরাস কোন মতেই প্রাকৃতিক নয়। আমি গবেষণা করে যা বুঝেছি তাতে হয়ত বাদুর অথবা ওই জাতীয় কোন প্রাণীর কোষ থেকে ভাইরাল স্ট্রেন নিয়ে তাকে রাসায়নিকভাবে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে তা মানব শরীরে ঢুকে মুহূর্তে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য প্রতিলিপি গঠন করতে পারে।" সম্প্রতি "Unusual Features of the SARS-CoV-2 ... Its Probable Synthetic Route" নামক গবেষণাপত্রে লি-মেং ইয়ান, শু কাং, জিয়ে গুয়ান এবং শ্যানচাং হু প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে সার্স কোভ-২ এর উৎস সম্পর্কিত বিষয়টি বিতর্কিত। বহুল দর্শিত নেচার মেডিসিন পাবলিকেশন দাবি করছে এই সংক্রমণের উৎস প্রাকৃতিক। বাদুর থেকে প্রাপ্ত যে ভাইরাসটিকে এরা প্রামাণ্য হিসাবে দাবি করছে সেটি হল Ra TG13 যার ৯৬% নিউক্লিওটাইড সজ্জায় সাদৃশ্য আছে সার্স কোভ-২-র সঙ্গে। কিন্তু Ra TG13 ভাইরাসের আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানীরা এর বিপরীতে ZC45 এবং ZXC21 ভাইরাস খুঁজে পেলেন বাদুরের শরীরে যার E প্রোটিন (স্ট্রাকচারাল প্রোটিন) এর সাথে সার্স কোভ-২ এর ১০০ শতাংশ সাদৃশ্য আছে, মেমব্রেন প্রোটিনে ৯৮.৬ শতাংশ, স্পাইক প্রোটিনের (S_2 অংশ) সাথে ৯৫ শতাংশ এবং Orf8 প্রোটিনের সাথে ৯৪.২ শতাংশ সাদৃশ আছে। এই সাদৃশ্য বিরল। তাই এই ভাইরাস দুটির যে কোন একটিকে বা দুটিকে সার্স কোভ-২ এর কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটি ভাইরাস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাইতে চিনের মিলিটারি রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে।

আলোচ্য গবেষণাপত্রে উক্ত বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন যে এই ভাইরাস দুটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে Ra TG13 ভাইরাসটিকে দেখানো হচ্ছে। এই ZC45/ZXC21 বাদুর ভাইরাস থেকে কনর্ভাজেন্ট ইভল্যুসানারি পথে হয়নি বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। গবেষকরা সার্স কোভ-২ এর স্পাইকে উপস্থিত ফিউরিন ক্লিভেজ পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে এটি Ac CoV-JC34 নামক ভাইরাসে একমাত্র দেখা গেছে যা ডঃ ঝেঙ্গালি শি দ্বারা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে চিহ্নিত হয়। অর্তাৎ সার্স কোভ-২ এর স্পাইক প্রোটিনে উপস্থিত বিরল ফিউরিন ক্লিভেজ ভাইরাসটির সংক্রমণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তা পরীক্ষাগারেই তৈরি করা হয়েছে।●কলকাতায় সকলের জন্য ই-পাস সংগ্রহ করে মেট্রো পরিষেবা চালু করা হল।●হংকং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত দুই ব্যক্তির শরীরে দ্বিতীয়বার কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের উদাহরণ পাওয়া গেল।

১৫. ●আরও একমাস পর চিনের তৈরি করোনা প্রতিষেধক সাধারণ মানুষের উপর প্রয়োগের উপযুক্ত হবে বলে সেদেশের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন। চিনে বর্তমানে চারটি টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে।●কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে রাজ্যসভায় জানিয়েছেন যে দেশে ৩০টি প্রতিষেধকের বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। তার মধ্যে ৭টি সংস্থাকে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অরগানাইজেশন পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে। এই তালিকার শীর্ষে আছে সিরাম, ক্যাডিলা, ভারত বায়োটেক ও রিলায়েন্স লাইফ সায়েন্স।

১৬. ●পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার সার্স কোভ-২ এর জেনেটিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে জাপানের করোনা ভাইরাসের জিনোমগুলির বিবর্তন বা মিউটেশন সবথেকে কম।

১৮. ●হু'র মতে সফল টিকা বিশ্বের ২৩৪ কোটি মানুষের (জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের) কাছে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ।

১৯. ●স্পেনের মাদ্রিদে পুনরায় লকডাউন চালু হল।

২০. ●ভারতের সংসদে সরকার স্বীকার করল যে দেশের প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা, লকডাউনে কত শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, কতজন চিকিৎসক কোভিড চিকিৎসায় যুক্ত, কতজন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী-সাফাই কর্মী মারা গেছেন, কত সংখ্যক প্লাজমা ব্যাঙ্ক

আছে তার কোন রেকর্ড নাই।

২২. ●হু'র মতে বিশ্বে ৩৮টি সংস্থার প্রতিষেধকের শেষ পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে।

২৬. ●হু'র মতে করোনা বিশ্ব মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ লক্ষ পার হতে পারে।

অক্টোবর ২০২০

২. ●ভারতে কোভিড-১৯-র মৃত্যুর সংখ্যা ১ লক্ষ অতিক্রম করল।

৪. ●আগামী বছর (২০২১) জুলাইয়ের মধ্যে গোটা দেশে ২৫ কোটি টিকা পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিল কেন্দ্র।

৮. ●চিন কোভ্যাক্স পরিকল্পনায় যোগ দিল। এই নিয়ে ভারতসহ ১৭০টি দেশ এর অংশীদারিত্ব নিল। পরিকল্পনা অনুসারে ২০২১ এর শেষে বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষকে সদস্য দেশগুলি টিকা সরবরাহ করবে জনসংখ্যার অনুপাতে। সংবাদপত্র 'দ্য হিন্দু' লিখেছে চিন কোন শর্তে অন্তর্ভুক্ত হল পরিস্কার নয় কারণ চিন গাভি (GAVI) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ, যা এই জোটের কোলিডার।

৯. ●চিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দেওয়া বিবৃতিতে জানিয়েছে যে নভেল করোনা ভাইরাস (সার্স কোভ-২) এর উৎস চিন নয়, চিন ভাইরাসটিকে চিহ্নিত করেছে এবং ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স গোটা পৃথিবীকে জানিয়েছে।

১২. ●লকডাউন শুরুর পর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার মুকেশ আম্বানির সম্পদ ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা করে বেড়েছে। অন্যদিকে শুধু এপ্রিল থেকে অগাস্টে দেশে বাঁধা বেতনের চাকরি হারিয়েছেন ২.১ কোটি মানুষ।

১৪. ●আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একই ব্যক্তির দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে মানুষের শরীরে করোনা প্রতিরোধক অ্যান্টিবডির আয়ু পাঁচ থেকে সাত মাস। এই তথ্য একটি সায়েন্স জার্নাল "ইমিউনিটি"-তে প্রকাশিত হয়েছে।

১৫. ●করোনা সংক্রমণ কমাতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকঁর আগামী ৬ মাস দেশে রাত ৯টা থেকে সকাল ৬টা অবধি শাট ডাউন ঘোষণা করল।

১৮. ●ভারত সরকার নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের একটি কমিটি জানালো যে দেশে করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায় পার হয়ে গেছে।

১৯. ●রাজ্যে নার্স নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন প্রশিক্ষিতি নার্সরা।●বিশ্বে করোনা সংক্রমণ চার কোটি'র গন্ডি টপকে গেল (৪,০৫,৫২,৫৮৪)।

২৩. ●কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ভারত বায়োটেকের করোনা টিকা কো-ভ্যাকসিনের ৩য় পর্যায়ের ট্রায়ালে সম্মতি জানালো।

২৭. ●কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৩৭০ জন, যা জুলাইয়ের মধ্যভাগের পরে সর্বনিম্ন।●ইতালিতে দ্বিতীয় দফায় সংক্রমণে কড়া বাধানিষেধ জারির প্রতিবাদে উত্তর ইতালিতে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ।

২৮. ●ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল জানিয়েছে যে ব্রিটেন,ফ্রান্স, স্পেন এবং ইউরোপের বহু দেশে করোনা সংক্রমণ দারুন বেড়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে মৃত্যু বাড়ি নি।

নভেম্বর ২০২০

২. ●দিল্লী 'হিন্দুরাও হাসপাতাল' এবং কর্পোরেশন পরিচালিত হাসপাতালে কমপক্ষে ৬৫০ জন নার্স অগাস্ট থেকে অক্টোবর অবধি বেতন না পেয়ে অনশন আন্দোলনে। একেই বলে কোভিড যোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রের মমত্ব!

৪. ●ভারতে এখনও অবধি করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত ৮৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৭৬ জন, মৃত ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬১১ জন।

৬. ●গ্রিসে করোনা সংক্রমণ রুখতে তিন সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করা হল।

৯. ●মার্কিন ভিত্তিক বহুরাষ্ট্রীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ফাইজার জানিয়েছে যে তাদের প্রস্তুত করোনা ভ্যাকসিন ৩য় ধাপের ট্রায়ালে ৯০ শতাংশ কার্যকর হয়েছে।

১১. ●রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড জানিয়েছে যে তাদের তৈরি করোনা টিকা 'স্পুটনিক ভি' তৃতীয় দফার ট্রায়ালে ৯২ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

১২. ●হু'র প্রধান ট্রেডস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস বলেন "আমরা কোভিডের সাথে লড়াই করে ক্লান্ড হয়ে যেতে পারি কিন্তু কোভিড এখনও ক্লান্ত হয়নি। এই ভাইরাসটিতে নির্দিষ্ট কোনও বদল ঘটেনি।"

১৩. ●ভারতে এখনও অবধি করোনায় আক্রান্ত ৮৭ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৯৫ জন এবং মৃত ১ লক্ষ ২৮ হাজার জন।

১৮. ●দেশের বড় শহরগুলির মধ্যে বেঙ্গালুরুতেই সংক্রমণে মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন ১.১ শতাংশ এবং সুস্থতার হার ৯৩.৯৪ শতাংশ। ভারতে মোট আক্রান্ত ৮৯,১২,৯০৭ এবং মৃত ১,৩০,৯৯৩ জন।

২৩. ●দেশে টানা ১৬ দিন আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাজারের কম। দেশে করোনায় এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত ৯১,৩৯,৮৬৬ জন, মৃত ১,৩০,৭৩৮ জন। আইসিএমআর-এর সূত্রে খবর দেশে এখনও অবধি ১৩,২৫,৮২,৭৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, পজিটিভিটির হার ৭ শতাংশ।

৩০. ●মণিপুর সরকার করোনা রোগীর চিকিৎসা দেওয়ার স্বার্থে রাজ্যের বেসরকারিক্ষেত্রে চিকিৎসকদের চিকিৎসা নিষিদ্ধ করল।●দিল্লী সরকার আরটিপিসিআর পরীক্ষার রেট সর্বেঅচ্চ ৮০০ টাকায় বেঁধে দিল, বাড়ি গিয়ে স্যাম্পেল নিলে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকা।● রাজস্থান সরকার সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্যের কনটেইনমেন্ট জোনগুলিতে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি লকডাউন ঘোষণা করল।● পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৮৩,৪৮৪ জন, মৃত ৮৪৭২ জন।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এবছর রসায়ন বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জেনিফার এ ডাউডনা এবং ইমানুয়েল শারপন্টিয়ের। (এই দুই বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সম্পর্কে বিষদে জানতে হলে 'জিনোম এডিটিং – সমস্যা ও সম্ভাবনা' নিবন্ধটি পড়ুন)

এছাড়া জীববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হার্ভে জে অলটার, মাইকেল হাওটন ও চার্লস এম রাইস। তাঁরা হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের খোঁজ দিয়ে এই পুরস্কার পেয়েছেন। এর আগে জলবাহিত হেপাটাইটিস এ, মানব রক্তে বাস হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছিল। ক্রমিক হেপাটাইটিসের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই ভাইরাস আবিষ্কার করেন অলটার। হাওটন এই আর.এন.এ ভাইরাসটির জিনোমকে আলাদা করার পথ দেখান এবং রাইস দেখান, অন্য কোনও কারণ ছাড়া এই নতুন ভাইরাসটি একাই হেপাটাইটিস ঘটাতে সক্ষম।

এবছর পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন পদার্থবিদ – রজার পেনরোজ, রেনহার্ড গেনজেল এবং অ্যান্ড্রিয়া ঘেজ। তিন জনেরই কাজ কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল নিয়ে। বিজ্ঞানী পেনরোজ জটিল গণিতের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হল কৃষ্ণগহ্বর। গেনজল ও ঘেজের নেতৃত্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পৃথক দু'টি দল দেখায় আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে (আকাশ গঙ্গা)-র কেন্দ্রে রয়েছে অতিকায় কৃষ্ণগহ্বর। পদার্থবিদ্যার নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিড হাভিল্যান্ড বলেছেন – "কৃষ্ণগহ্বর যে আছে, তার তত্ত্বগত ভিতটা দিয়েছেন পেনরোজ। যার ভিত্তিতে আমরা আশা করতে পারি, বাইরে গিয়ে খুঁজলে পেতে পারি সেগুলিকে।" অন্যদিকে জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব এক্সট্রাটেরেস্টিয়াল ফিজিক্স-এর বিজ্ঞানী গেনজেল ও মার্কিন বিজ্ঞানী ঘেজ বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্যাস ও ধুলোর বাধা কাটিয়ে পৃথিবী থেকে মিল্কিওয়ের কেন্দ্র পর্যন্ত নজর চালাতে গিয়ে এর সন্ধান পান ■

জৈব প্রযুক্তিতে শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার

জিনোম এডিটিং – সমস্যা ও সম্ভাবনা

– পঞ্চানন মণ্ডল

বেশিরভাগ বংশগত বা জিনগত রোগের নেপথ্যে আমাদের ডিএনএ-র কোনো না কোনো হাত থাকে। কিছুকাল আগেও মানুষ ভাবত যদি ডিএনএ এডিট করে এসব সমস্যা সারিয়ে ফেলা যেত তাহলে রোগ গোড়া থেকে নির্মূল হয়ে যেত। তবে এ আর এখন কল্পনাহিনী নয়, বাস্তব। আর তা সম্ভব হয়েছে জিনোম এডিটিং দ্বারা।

এ এক নতুন প্রযুক্তি যা দ্বারা ডিএনএ কোড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে জিনতত্ত্ব বা জেনেটিকস এবং কোষবিদ্যা বা সেল বায়োলজি ক্ষেত্রে রোগের প্রতিকার আবিষ্কারের ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে নতুন আশা। কেউ কেউ আবার ভাবছেন এতে "ডিজাইনার বেবি" ধারণাটি মাথাচাড়া দিতে পারে এবং বিভিন্ন বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এ কারণে এক্ষেত্রে যেন কোন ধরনের সমস্যা না হয় তার জন্য এই প্রযুক্তির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আছে।

ডিএনএ-এর পরিব্যক্তি (মিউটেশন) হবার কারণে বেশিরভাগ নেপথ্যে এর কিছু না কিছু হাত থাকে। বর্তমানে থেরাপির সাহায্যে বিভিন্ন লক্ষণের মাত্রা কমানো গেলেও সমস্যাটির মূলে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছিল না। এর কারণ হল তিন বিলিয়ন লেটার ডিএনএ কোডের মাঝে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনাটা প্রায় দুষ্কর ছিল। আর আমাদের মতো জলজ্যান্ত মানুষের মাঝে এমন পরিবর্তন আনার কথা তো চিন্তাই করা যেত না! কিন্তু ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে গবেষণায় CRISPR/Cas প্রযুক্তির সাহায্যে ডিএনএ পরিবর্তন করার ব্যাপারটি জানা যায়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে গবেষক এমানুয়েল শারপন্টিয়ের এবং জেনিফার ডাউডনা জিনোম এডিটিং-এর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন এই দুই বিজ্ঞানী।

ডিএনএ কেটে ফেললে সে নিজেই নিজেকে সারিয়ে তোলা শুরু করে এবং এ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে রোগের জন্য দায়ী কোনো একটি জিন সারিয়ে তোলা যায় অথবা অকার্যকর করে দেওয়া যায়। এই প্রযুক্তি আসার সাথে সাথে মানব ভ্রূণের মাঝে জিনে পরিবর্তন আনার ব্যাপারটি এখন অনেক সহজ

মনে হচ্ছে। তবে এ নিয়ে অনেকে শঙ্কিত কারণ এখন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজাইনার বেবি তৈরি আর অসম্ভব নয়। কিন্তু নির্ভুল ডিএনএ সার্জারি সম্ভব হলেও, ডিএনএ এর পরিবর্তনের ফলে মানুষের শরীরে এর কী প্রভাব দেখা দেবে আমরা তার ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত নই।

আর সাধারণ সার্জারির মতো এই সার্জারিতেও ঝুঁকি রয়েছে বই কি। ডিএনএ কাঠামোতে সার্জারির কাজটি যে প্রোটিনের সাহায্যে করা হবে, সে ভুলভাল জায়গায় ডিএনএ কেটে ফেললে দেখা দেবে বিপদ। হয়তো একটি দরকারি জিন কাটা পড়বে এবং রোগ প্রতিরোধের পরিবর্তে ঝুঁকি আরো বেড়ে যাবে। এসব কারণে গবেষকদের মাঝে যথেষ্টই উদ্বেগ দেখা গেছে।

এখন জানা যাক কী এই জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি।

ইদানিং জিনোম এডিটিং বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, জিনোম এডিটিং করে বহু জটিল রোগের সমাধান করা সম্ভব হবে। মানুষের আয়ুও বহু গুনে বাড়িয়ে ফেলা যাবে। কৃষিক্ষেত্রে আরেকটি সবুজ বিপ্লব ঘটানোও অসম্ভব কিছু নয়। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে অদূর ভবিষ্যতে বায়োলজিক্যাল মিরাকেল ঘটাবে জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি। কিন্তু এই প্রযুক্তিটি আসলে কী? কেন একে নিয়ে এত আলোচনা?

একে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে ডিএনএ অণুর গঠন বিন্যাসকে। জীবজগতের বংশগতির ধারক ও বাহক হলো ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ (DNA) অণু। জীবকোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসমের মধ্যেই মূলত এর অবস্থান। ডিএনএ অণুগুলি বেশ বড়ো আকারের হয়। দুটো লম্বা সুতোর মতো পরস্পরকে এরা জড়িয়ে থাকে। তাদের এই জড়িয়ে থাকা কাঠামোটিকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ডিএনএ ডাবল হিলিক্স। এই ডাবল হিলিক্স কাঠামোটি তৈরি হয়েছে ডিঅক্সি রাইবোজ, ফসফেট এবং চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষার (base) দিয়ে।

ডিএনএ-র কাজ হলো জীব জগতের জেনেটিক কোডকে ধারণ করা। জেনেটিক কোডের বর্ণমালায় রয়েছে ডিএনএ-র চারটি নাইট্রোজেন বেস, যাদেরকে চারটি অক্ষর **(ATGC)** দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই চারটি মাত্র "অক্ষরের" সামগ্রিক বিন্যাসে এককোষী ব্যাকটেরিয়া সহ যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনোম রচিত হয়েছে। জিনোম বলতে কোন জীবের সামগ্রিক ডিএনএ-কে বোঝায়। জিনোমের আকার নির্ভর করে নাইট্রোজেন বেসের সংখ্যার উপর। মানুষের জিনোমে প্রায় তিন বিলিয়ন নাইট্রোজেন বেস জোড় (base pair) রয়েছে।

জিনোমের ডিএনএ-র পুরোটাই কিন্তু জিন (gene) নয়। জিন বলতে জিনোমের সেই অংশকেই বোঝায় যা নির্দিষ্ট কোন প্রোটিন তৈরির কোডকে ধারণ করে। জিনোমের বেশির ভাগ অংশই হলো কোডবিহীন ডিএনএ। জিনোমের ভেতর থেকে জিনগুলোকে রীতিমতো খুঁজে বের করতে হয়। আর এই খুঁজে বের করার কাজটি বেশ কঠিন। মানুষের জিনোমে খুঁজে পাওয়া গেছে ২০ হাজারের মতো জিন। এই জিনগুলো সম্মিলিত ভাবে মানবের সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন জিনকে পরিবর্তন করে জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোকেও পরিবর্তন করা সম্ভব। এটা অনেকটা ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখা এডিট করার মতো ব্যাপার। আমরা যেমন লেখার ভেতর কোনো শব্দ বা অক্ষরকে ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করতে পারি, তেমনি বিজ্ঞানীরা এমন কিছুপ্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে তারা জিনোমের ভেতরে ইচ্ছেমতো জিনের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এই প্রযুক্তির নাম হলো জিনোম এডিটিং।

বর্তমানে জিনোম এডিটিং করার তিনটি প্রধান প্রযুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে দুটি প্রযুক্তি একটু পুরনো (ZFN এবং TALEN)। আর একটি প্রযুক্তি হলো নতুন। এই নতুন প্রযুক্তিটির নাম হলো ক্রিসপার/ক্যাস নাইন(CRISPR/Cas9)। এই নতুন প্রযুক্তিটি আবিষ্কার হবার পর একে নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই আশাবাদী। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা এখন খুব সহজেই ফলপ্রসূভাবে জিন এডিটিং করে জিনোমের ভেতরে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে পারবেন। অনেকে একে বলছেন, **"জৈবপ্রযুক্তিতে শতাব্দীর সবচেয়ে সেরা আবিষ্কার"**।

এখন দেখে নেয়া যাক CRISPR/Cas9 প্রযুক্তিটি কীভাবে কাজ করে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ব্যাক্টেরিয়ার জিনোমে কিছু কিছু সজ্জাক্রম (সিকোয়েন্স) আছে, যার মধ্যে অনেকগুলো পুনরাবৃত্তি থাকে। এদেরকে বলে ক্রিসপার (CRISPR এর পুরো নাম Clustered regularly interspaced short palindromic repeat)। এটি আসলে প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরক্ষা হিসাবে কাজ করে। ব্যাকটেরিয়া যখন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এই ক্রিসপার সিকোয়েন্স থেকে কিছু প্রোটিন উৎপন্ন হয়। এই প্রোটিনগুলি ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে। এই ক্রিসপার প্রোটিনগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে Cas9। যদিও Cas9 প্রোটিনের কাজ হলো ভাইরাসকে আক্রমণ করা কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন তাকে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন কাজে লাগাচ্ছেন। আর এই কাজটি হলো জিনোম এডিটিং করা।

তারা Cas9 প্রোটিনের সাথে জুড়ে দিয়েছেন ছোট্ট একটি গাইড আরএনএ (gRNA) অণু। এই অণুটিতে মাত্র গোটা

কুড়ি বেস পেয়ার থাকে। এর কাজ হলো জিনোম এডিটিং করার জন্য নির্দিষ্ট (টার্গেট) জিনটিকে সনাক্ত করা। এই গাইড অণুটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে এটা শুধুমাত্র টার্গেট জিনটির সাথেই যুক্ত হতে পারে। আর টার্গেট জিনটি পাওয়া মাত্র Cas9 প্রোটিন জিনোমের ডিএনএ কে কেটে দুভাগ করে ফেলে। তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই ডিএনএ নিজেকে আবার জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে। আর এই সুযোগে বিজ্ঞানীরা সেখানে জুড়ে দিতে পারেন তাদের পছন্দের জিন(Desire gene) অথবা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন কোনো ক্ষতিকর জিনকে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন গবেষণাগারে CRISPR/Cas9 প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের জিনোম এডিটিং করা হচ্ছে। তবে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনো অনেক বাধা নিষেধ আছে। উদ্ভিদ প্রজনন এর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধানের ফলন বাড়াতে এবং Amylose এর পরিমাণ কমাতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এই প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।

সারকথা হল এই প্রযুক্তির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটা জিনোমের মধ্যে টার্গেট জিনকে খুব সহজেই সনাক্ত করে তার মধ্যে কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এজন্যই বিজ্ঞানীরা এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিয়ে খুবই আশাবাদী।■

সূত্র ঃ

১) https://medlineclus.gov/genetico/understanding/genomicresearch/genomeediting

২) https://www.hcbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5131771/

৩) https://www.sciencemag.org/features/2019/09/beyond-cripper-what-s-current-and-upcoming-genome-editing

৪) https://en.m.wikipidia.org/wiki/Genome_editing

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের খাদ্যতালিকা ছিল মাংসবহুল

– রণজিৎ চক্রবর্তী

আমাদের চারপাশের বস্তুগজৎ (যার মধ্যে মানব সমাজও অন্তর্ভুক্ত) পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের নিয়মগুলি জেনে নিয়ে মানব সমাজের উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে তাকে ব্যবহার করা বিজ্ঞানের মূল বিষয়। এজন্য আমাদের পিছনের দিকে অর্থাৎ অতীতের অনুসন্ধান করতে হয়। যার দ্বারা বোঝা যায় পরিবর্তনের গতিপথ। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অতীত অনুসন্ধানের এক অতিগুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী

খাদ্যভ্যাস মানব সভ্যতার বিশেষ পরিচয় বহন করে। গত পাঁচশ বছর ধরে দুনিয়াজুড়ে বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে খাদ্যভ্যাসের দ্রুত পরিবর্তন ও আদানপ্রদান ঘটে চলেছে। তার আগে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্যাভ্যাস ছিল আঞ্চলিক ধরনের এবং পরিবর্তনের গতি ছিল স্লথ।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিষয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে **'জার্নাল অফ আর্কিওলজিক্যাল সাইন্স'** এ (Journal of Archaeological Sciecnce - Volume-125. January 2021)। গবেষণাপত্রটির রচনাকার হলেন অক্ষেতা সূর্যনারায়ণ (কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য), মিরিয়ম কুবাস (ওভিডো বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন), কার্ল হেরন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম), অলিভার ক্রেগ (ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়), বসন্ত সিন্দে (ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স, গান্ধীনগর-গুজরাট) ও রবীন্দ্র সিংহ (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)।

গবেষণাপত্রের শিরোনাম **'উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিন্ধু সভ্যতায় মৃৎপাত্রের লিপিড অবশেষ'**।লিপিড হল এক বিস্তৃত শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক পদার্থ। শর্করা ও প্রোটিনের সাথে

দেহকোষ গঠনে যার বিশেষ ভূমিকা আছে। লিপিড সাধারণতঃ জলে দ্রবীভূত হয় না। অ্যালকোহল বা অন্য জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়।

গবেষণার বিষয়বস্তু হল অতীতে মাটির পাত্রে ব্যবহারের সময় যে লিপিড (ফ্যাট-তেল জাতীয় রাসায়নিক) শোষিত হয়েছিল তার অবশেষ নিষ্কাশন করা এবং সনাক্ত করা। লিপিড তুলনামূলক ভাবে সময়ের সাথে সাথে কম বিনষ্ট (degrade) হয়। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মাটির পাত্রের লিপিড অবশেষ বিশ্লেষণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত। এই বিশ্লেষণ মাটির পাত্র দ্বারা শোষিত দুধ-মাংস এবং এর সাথে উদ্ভিজ্জ উপাদানের মিশ্রণের রাসায়নিক প্রমাণ দেয়। এই বিশেষ গবেষণায় লিপিড অবশেষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দক্ষিণ-এশিয়ায় সিন্ধু নদের তীরবর্তী সভ্যতায় মাটির পাত্রে কি ধরনের খাদ্যবস্তু রাখা হত তার অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যে স্থান ও ক্ষেত্রগুলিতে এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তার মধ্যে বর্তমান ভারতের হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে।

একথা বর্তমানে প্রমাণিত যে পৃথিবীর প্রাচীন সুসংবদ্ধ সভ্যতার অন্যতম সিন্ধু নদের উপত্যকার সভ্যতা। যা বর্তমান পাকিস্তান–উত্তর-পশ্চিম ভারত–পশ্চিম ভারত–আফগানিস্তানের বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতায় প্রায় ১৪০০ নগর ও শহর গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছিল বড়। প্রায় ৮০,০০০ অধিবাসীর বাস ছিল। যে এলাকাজুড়ে এর বিস্তৃতি তার মধ্যে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের এলাকা, মৌসুমী বৃষ্টিপাতের এলাকা এবং দুই ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলও সামিল ছিল। ভূপ্রকৃতিগতভাবে নদী গঠিত সমভূমি, পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চল, মরুভূমি, রুক্ষ কাঁটাঝোপযুক্ত অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকা সামিল ছিল। নির্দিষ্টভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে পরিণত হরপ্পা যুগে (২৬০০/২৫০০ – ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মাটির পাত্রের লিপিড অবশেষ বিশ্লেষণ। দীর্ঘ সময়ে বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার তারতম্য, আম্লিক ও ক্ষারীয় ভারসাম্যের (pH ফ্যাক্টর) পরিবর্তন এবং এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ক্ষেত্রগুলির সংরক্ষণের অভাব সত্ত্বেও ৭১% পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে লিপিড অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

উপরোক্ত বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে যে মৃৎপাত্রগুলোতে বীজ ও উদ্ভিদজাত অবশেষ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তা থেকে প্রাপ্ত অবশেষ মাংস বহুল খাদ্যতালিকার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। লিপিড অবশেষ বিশ্লেষণ নিশ্চিতভাবে গোমাংস এবং ছাগল-ভেড়া ও শুয়োরের মাংষের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ দেয়। যার মধ্যে গোমাংসের অবশেষ সবচেয়ে বেশি। সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থানগুলিতে প্রাণীকূলের যে অবশেষ সংগৃহীত হয়েছে তার ৮৩ শতাংশ গৃহপালিত প্রাণীর, গরু ও মোষের হাড় ৫০-৬০%, ভেড়া ও ছাগলের ১০%, গরুর হাড়ের আধিক্য সিন্ধু জনসংখ্যার মধ্যে গো-মাংস খাবার ব্যাপক প্রচলনের ইঙ্গিত বহন করে। এর সাথে আছে ছাগল ও ভেড়া, বন্যজন্তু যেমন হরিণ, অ্যান্টিলোপ, গ্যাজেল, খরগোশ, পাখি, নদীজ ও সামুদ্রিক প্রাণীর উৎসও অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই বহু বিস্তৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত মাংস সিন্ধু অধিবাসীদের খাদ্যতালিকায় নিয়মিত স্থান পেয়েছিল। এই বিন্যাসটা উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রত্নস্থানগুলোর সাথে সমধর্মী। সেখানেও গৃহপালিত ও বন্য স্তন্যপায়ীর সঙ্গে অল্প পরিমাণে পাখি-সরিসৃপ, নদীজ মাছ এবং শামুক জাতীয় উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। খরগোশ ও পাখি খাদ্যতালিকায় থাকলেও মুরগী খাদ্য হিসেবে থাকার প্রমাণ প্রায় না থাকার মত।

এছাড়াও গলার কাছে খাঁজযুক্ত বিশেষ ধরনের পাত্র (বয়াম বা জার) ও বিরাট আকারের পাত্র পাওয়া গেছে। যার অবশেষ বিশ্লেষণ দেখায় এগুলোতে মদ ও তেল সংরক্ষিত থাকতো। পাত্রের আকার, আকৃতির মধ্যে মিল রান্নার পদ্ধতির সাধারণ আঞ্চলিক সমানতাকে চিত্রিত করে। প্রত্নপ্রমাণ মাংস (বিশেষতঃ গোমাংস) সমৃদ্ধ – তার সাথে দুধজাত এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীজ উৎসের মিশ্রণ সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দিলেও বর্তমান রাজনৈতিক-সংস্কৃতিতে এই অনুসন্ধান হয়তো তীব্র বিতর্ক ও বিদ্বেষ এর সৃষ্টি করবে। কারণ ঐ 'গোমাংসের' উপস্থিতি। কিন্তু তার দ্বারা সত্য-অসত্য হয়ে যায় না। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকরা এদিকে আগেই ইঙ্গিত করেছিলেন। এমনকি পুরাণ ও বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রেও এমন খাদ্যভ্যাসের অকাট্য প্রমাণ আছে। বিজ্ঞানের পাথুরে প্রমাণ তাকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে।■

বিজ্ঞান মনস্ক আয়োজিত কৃষিমেলায় যোগ দিন

স্থান ঃ কানপুর মা মনসা স্বেচ্ছা সেবক সমিতি ও সংলগ্ন মাঠ, কানপুর, হাওড়া।
সময় ঃ ৩১শে জানুয়ারি ২০২১, সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ৮টা।

ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ

অগাস্ট ২০২০

১. *ব্রাজিলের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তার উপগ্রহ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে জানাচ্ছে জুলাই, ২০১৯ এর তুলনায় জুলাই, ২০২০-তে আমাজন বনাঞ্চলে ২৮% দাবানল বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই, ২০১৯-তে যেখানে দাবানলের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩০০টি, জুলাই, ২০২০-তে তার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮০০ টি। (রয়টার)

২. *বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে পোষক কোষের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবার জন্য দায়ী SARS-COV-2 ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের কার্যক্ষমতাকে বিনষ্ট করার জন্য একটি উপায় তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাইরাসটি পোষক কোষের যে স্থানে আবদ্ধ হয় তার অনতিদূরে একটি পরা তড়িতাধানযুক্ত স্থান পরিলক্ষিত হয়েছে যাকে অপরা তড়িতাধানযুক্ত অন্য কোন যৌগ দ্বারা প্রশমিত করলে ভাইরাসটির আক্রমণ ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেতে দেখা গেছে। (সিএনবিসিটিভি)

৩. * মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণ উচ্চভূমি অঞ্চলের উপত্যকামন্ডলী প্রধানত হিমবাহের নীচে গঠিত হয়েছে, নদী-জলের মুক্তপ্রবাহের ফলে নয়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এমনটাই জানিয়েছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন অতীতে মঙ্গলের তাপমাত্রা যা এতদিন মনে করা হচ্ছিল তার থেকে অনেক কম ছিল। (নেচার জিওসায়েন্স)

৭. *একটি গবেষণায় জানা গেছে যে বিশ্বউষ্ণায়নের উপর সাম্প্রতিক অতিমারির প্রভাব অত্যন্ত নগন্য। বর্তমান অতিমারির পরিস্থিতি বিরাজ করলে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগদ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.০১ $\pm$ ০.০০৫° সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে।

১০. *মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের অন্তর্বর্তীর একটি কক্ষপথে ঘূর্ণনরত বামন গ্রহ সেরেস-এ নিশ্চিতভাবে জলের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আমাদের সৌরজগতে নেপচুনের কক্ষসীমার মধ্যে সেরেস-ই হল একমাত্র বামন গ্রহ। নাসার 'ডন' অভিযান থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, সেরেস-এর বুকে রয়েছে অসংখ্য লোনা জলের গভীর আধার। (নাসা)

১১. *মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আকাশগঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণনরত একটি নক্ষত্র আবিস্কৃত হয়েছে যার সর্বাধিক বেগ আলোকের গতির ৮%। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল)

১২. *জলবায়ু সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১০ থেকে ২০১৯ দশকটি হল এযাবৎ (পৃথিবীব্যাপী নথিভুক্তির নিরীখে) উষ্ণতম দশক। এই দশকের তাপমাত্রা গড়-তাপমাত্রা থেকে ০.৩৯° সেলসিয়াস (০.৭° ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দটি এযাবৎ নথিভুক্তির নিরীখে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় উষ্ণতম বছর। (দ্য গার্ডিয়ান)

*২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানীরা কুমেরু অঞ্চলে এমন একটি ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছিলেন যা কেবলমাত্র বায়ু সেবন করে বেঁচে থাকতে সক্ষম। ইদানীং বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কেবলমাত্র কুমেরু নয় পৃথিবীর বিভিন্ন শীতল মরুঅঞ্চলেও এই ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কার একদিকে পৃথিবীর কার্বনচক্র সম্বন্ধে যেমন নতুন তথ্য সরবরাহ করছে আবার অন্যদিকে এক্সট্রিমোফাইল (যে সমস্ত জীবাণু কঠিনতম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকতে পারে)-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে স্বীকার করছে, ভিনগ্রহের মৃত্তিকায় জীবাণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেও উজ্জ্বল করছে। (নিউ অ্যাটলাস)

১৩. *নাসা-র বিজ্ঞানীরা 'বিটেলজ্যুস' নামক একটি নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ হ্রাস পাওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নক্ষত্রটি ওরিয়ন নক্ষত্রমন্ডলের অন্তর্গত ও ঐ নক্ষত্রমন্ডলীর দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। রাতের আকাশে 'বিটেলজ্যুস' হল দশম উজ্জ্বলতম নক্ষত্র যা খালি চোখে দৃশ্যমান হয়। নক্ষত্রটি মহাতারকা (সুপারজায়েন্ট) গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী আগামী এক লক্ষ বছরের মধ্যেই তারকাটি সুপারনোভ-তে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে নিস্প্রভ হবে ও তার বিবর্তন সম্পূর্ণ করবে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এরপর কিছুদিন ঔজ্জ্বল্য স্থির থাকার পর আবার তা বৃদ্ধি পায় ও পুনরায় ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন এক বিশেষ ধরনের ধুলিঝড়ের কারণে নক্ষত্রটির আকাশে প্রচুর পরিমাণ কণা সঞ্চিত হয় যার ফলে আলোর বিকিরণ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৭. *মহাকাশ গবেষকেরা জানিয়েছেন যে সৌরমন্ডল বহির্ভূত বস্তু 'ওমুয়ামুয়া' হিমশীতল হাইড্রোজেন দ্বারা সৃষ্ট, পূর্বের এই ধারণা ভ্রান্ত। যদিও বস্তুটির কোন উপাদান দ্বারা গঠিত সে

ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নয়। তবে, 'ওমুয়ামুয়া' ভিন নক্ষত্রজগতের প্রযুক্তি, এই ধারণা বিজ্ঞানীরা পরিত্যাগ করেনি যদিও এটা প্রমাণ করা সময় সাপেক্ষ। (লাইফ সায়েন্স)

২০. *২০১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রীনল্যান্ডের হিমভান্ডার থেকে অদ্যাবধি রেকর্ড পরিমাণ ৫৩২ বিলিয়ন মেট্রিক টন বরফ গলেছে। এর আগের রেকর্ড ছিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দে, ৪৬৪ বিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০১৭ ও ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে গলনের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

২৬. * বিজ্ঞানীরা একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীতে যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া বেঁচে থাকে বিশেষতঃ ডিইনোকক্কাসরেডিওডিউরান-এর মতো ব্যাকটিরিয়া, মহাকাশে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়াটি হল সবচেয়ে সহিষ্ণু যা অত্যন্ত ঠান্ডা, কমচাপ, শুষ্ক পরিবেশে এমনকি বিভিন্ন বিকিরণ সহ্য করেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণ প্যান্সপারমিয়া-র ধারণাকে সমর্থন করে। এই হাইপোথিসিস বা প্রকল্প অনুযায়ী মনে করা হয় যে মহাকাশব্যাপী সমস্ত বস্তু অর্থাৎ মহাকাশে ভাসমান ধূলিকণা, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব বিরাজমান। (সিএনএন নিউজ)

২৭. *গবেষকরা জানাচ্ছেন পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলো সম্পূর্ণ জলপূর্ণ হতে গেলে যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন সে পরিমাণ জল পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই ছিল।

২৮. *বিজ্ঞানী ইলন মাস্ক-এর সংস্থা 'নিউরোলিঙ্ক' জানাচ্ছে, মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী ও কলাকৌশল আরও পরিস্কারভাবে জানা-বোঝার জন্য শূকরের শরীরে মস্তিষ্ক-কম্প্যুটার ইন্টারফেস চীপ স্থাপন করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর

১. *বিজ্ঞানীরা নতুন এক ধরনের অবলোহিত বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা সেকেন্ডে ৮০ মিলিয়ন বর্ণালী গঠন করতে সক্ষম। এই পদ্ধতিটি পূর্বের পদ্ধতিগুলির তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ গতি সম্পন্ন। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে এই মহাবিশ্বের অজানা বস্তুর আণবিক গঠন ও তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য জানার ক্ষেত্রে এক উল্লম্ফন ঘটতে চলেছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। (টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়)

২. *এযাবৎ সর্ব্বৃহত কৃষ্ণ গহ্বর সংযুক্তি আবিষ্কারের কথা নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। দুটি কৃষ্ণ গহ্বরের কক্ষের অবস্থান খুব কাছাকাছি হলে তাদের সংযুক্তি ঘটে। এগুলিকে যুগ্ম বা বাইনারী কৃষ্ণ গহ্বর বলা হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ঐ কৃষ্ণ গহ্বরটি চিহ্নিত করা হয় যা ১৪২ সৌর-ভরের সমতুল্য। এরদ্বারা সৃষ্ট মহাকর্ষ তরঙ্গটিকেও চিহ্নিত করা গেছে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৮. *উত্তর ভারতের রামনগরে বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৩ মিলিয়ন বছরের পুরানো পেষণদন্তের (মোলার) জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে এটি গিবনের এক বিলুপ্ত প্রজাতির দাঁত। বিজ্ঞানীরা গিবনের ঐ প্রজাতিটির নামকরণ করেছেন কপি রামনগরেনসিস। বিজ্ঞানীরা আগেই জানিয়েছিলেন যে গিবনের পূর্বপুরুষদের আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় অভিগমন হয়েছিল। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের এই ধারণাকে একদিকে নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে গিবনের অভিগমন বা মাইগ্রেশনের রুট বা গমনপথটি সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। (সায়েন্স নিউজ)

১৪. *লন্ডনের রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি জানাচ্ছে শুক্রগ্রহের পরিমন্ডলে বিজ্ঞানীরা ফসফিন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছেন। এই অনুসন্ধান শুক্রগ্রহে জীবাণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে দৃঢ় করেছে। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৫. *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান' তার ১৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কারুর নাম অনুমোদন করল। এই বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জো বাইডেন-এর নাম অনুমোদন করে। পত্রিকার এক সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, '১৭৫ বছরের ইতিহাসে এই পত্রিকা কোনদিন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কারুর নাম অনুমোদন করেনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করছেন বিশেষতঃ কোভিড পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকা আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।' উল্লেখ্য, অতীতে এই পত্রিকায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সহ বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। (সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান)

১৮. *মহাকাশ গবেষকেরা এই প্রথমবার আকাশগঙ্গা ছায়াপথের বাইরে ঘূর্ণি ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত একটি বহির্গ্রহের (M51-ULS-1b) সন্ধান পেয়ছেন।

২১. *বিজ্ঞানীরা মহাকাশের আন্তঃনক্ষত্র অঞ্চলের ধূলিকণার মধ্যে জলের সন্ধান পেরেছেন। ধূলিকণার সিলিকেট যৌগের সঙ্গে বরফকণা মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। (নেচার অ্যাস্ট্রোনমি)

অক্টোবর

৫. * ১২৩টি দেশের বিজ্ঞানীরা ২৫ বছর ধরে গবেষণা

চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পুনর্বীকরণ শক্তির ব্যবহারের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণ কম হয় কিন্তু নিউক্লিয় শক্তির দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনে তা হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন নিরসনের জন্য তড়িৎ উৎপাদনের এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ের সাথে পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন। (ফিউচারিজম)

*এযাবৎ সমুদ্রতলে সঞ্চিত মাইক্রোপ্লাস্টিকের পরিমাণ ১৪ মিলিয়ন টন। এই পরিমাণ পূর্বের ধারণার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বছরে যে পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক সমুদ্রে প্রবেশ করছে বলে মনে করা হয়েছিল, বাস্তবে তার পরিমাণ প্রায় ১.৭ গুণ। (নিউইয়র্ক টাইমস)

৭. *বিজ্ঞানীরা এই প্রথমবার নাইট্রাস অক্সাইড চক্রের পরিস্কার উপস্থাপনা পেশ করলেন। বায়ুমন্ডলে গ্যাসটির নিঃসরণ ও শোষণের পরিমাণ পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। নাইট্রাস অক্সাইড একটি গ্রীন হাউস গ্যাস। উপস্থাপনায় দেখানো হয়েছে গত চার দশকে বায়ুমন্ডলে গ্যাসটির নিঃসরণ ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। (phys.org)

৮. *'দ্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন'-এর ৩৪ জন সম্পাদকই সর্বসম্মতিক্রমে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সমালোচনা করেছে। করোনা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে না পারা, বেপরোয়াভাবে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি কারণে সম্পাদকেরা প্রতিবাদ করছেন – এই মর্মে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করা হয়েছে। (সিএনএন)

১৩. *৫৩০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত অতিদানবিক নক্ষত্র বিটলজ্যুস এর আকৃতি ও দূরত্ব পূর্বের অনুমানের তুলনায় ২৫% কম বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল)

*উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের পরিমন্ডলে গ্লাইসিনের সন্ধান পেয়েছেন। গ্লাইসিন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রোটিনের একক) যার উপস্থিতি ঐ গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে প্রবল করছে। (ইউনিভার্স টুডে)

১৪. *১৫০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 'কার্বনাসিয়াস সালফার হাইড্রাইড' নামক একটি যৌগের উপর পরীক্ষা চালিয়ে রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সুপার কনডাক্টিভিটি উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। ২৬০ মেগাপাস্কেল চাপে বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা করেন। এর পূর্বে ৩৫০ সে তাপমাত্রায় এটা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। (সায়েন্টিফিক আমেরিকান)

১৬. *ফ্রাঙ্কফুট, জার্মানীর গোথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এযাবৎ ক্ষুদ্রতম সময়কাল পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই সময়কালের পরিমাপ হল ২৪৭ জেপ্টোসেকেন্ড। একটি ফোটন কণা যে সময়ে একটি হাইড্রোজেন অণুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে তার পরিমাপ হল ২৪৭ জেপ্টোসেকেন্ড। এক জেপ্টোসেকেন্ড সময় হল এক সেকেন্ডের $১০^{-২১}$ ভাগের এক ভাগ। (সায়েন্স নিউজ)

১৯. * গবেষকেরা জানিয়েছেন যে শিশু পানীয়ের জন্য যে পলিপ্রোপিলীন নির্মিত বোতল ব্যবহার করা হয় তা মাইক্রোপ্লাস্টিক বর্জন করে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন প্রতি শিশু প্রায় ১৪৬০০ থেকে ৪৫৫০০০০ মাইক্রোপ্লাস্টিকের কণা গ্রহণ করে। পলিপ্রোপিলীন নির্মিত পাত্রে গরম তরল রাখলে বেশি পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক বর্জিত হয়। (দ্য গার্ডিয়ান)

২০. *মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র মহাকাশযান ISIRIS-REx, একটি গ্রহাণু (বেনু)-কে স্পর্শ করে ও গ্রহাণু থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। এই ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে তৃতীয়বার ঘটল। নমুনা নিয়ে মহাকাশযানটি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে ফিরে আসবে বলে জানানো হয়েছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৬. *তিনটি ভিন্ন অভিযান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের উত্তর মেরুতে জলের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন। (দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৭. *শরীরে ভিটামিন-ডি-র পরিপূরকের প্রভাব কি তা সঠিকভাবে অনুসন্ধান করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রায় ৫ হাজার জন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল 'করোনাভিট' সংঘটিত করেছেন। কোভিড-১৯, শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ ইত্যাদি পরিস্থিতিতে ভিটামিন-ডি-এর ভূমিকা কি জানার জন্যই এই কর্মকান্ড সংঘটিত করা হয়েছে। (সায়েন্স নিউজ)■

রিপোর্ট ঃ

চুক্তিভিত্তিক এনএইচএম কর্মীদের আন্দোলনের সমর্থনে বিজ্ঞান মনস্ক

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ এনএইচএম কর্মীদের আন্দোলনের সমর্থনে প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে। এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল –

"পশ্চিমবঙ্গে এনএইচএম বা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের চুক্তি ভিত্তিক কর্মীরা ৫ দফা দাবিতে গত কয়েক মাস যাবত ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল হেলথ মিশন জয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতৃত্বে একজোট এনএইচএম কর্মীদের দাবি, সকল এনএইচএম কর্মীর স্থায়ীকরণ; বেতন পুনর্বিন্যাস বা পে র‍্যাশনালাইজেশন; প্রত্যেক এনএইচএম কর্মীর ক্যাটাগোরাইজেশন; যে সকল পদ কেন্দ্রের আরওপি'তে অনুমোদন পায় নি সেগুলির অনুমোদনের ব্যবস্থা করা; এবং যে এনএইচএম কর্মীরা কর্মরত অবস্থায় কিংবা কোভিড-১৯-এ মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও চাকুরীর ব্যবস্থা করা।

পশ্চিমবঙ্গের এনএইচএম কর্মীরা তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত ১০ই নভেম্বর, ২০২০ রাজ্য ব্যাপী প্রতিটি জেলায় দুঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন। এরপর ৮ই ডিসেম্বর, ২০২০ প্রতিটি জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে তাঁদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছেন এবং ধরনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছেন। এরপর ৪ঠা জানুয়ারি, ২০২১ তাঁদের জয়েন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে কলকাতায় রানী রাসমনি রোডে কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করেছেন।" ...

"গ্রাম এবং শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল সহ প্রত্যন্ত গ্রামের সাবসেন্টারে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন এই এনএইচএম কর্মীরা। অঙ্গণওয়াড়ি কেন্দ্র এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ সরবরাহ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, টিকাকরণ, এলাকার বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া রোগীর খোঁজ করা ও তাঁদের চিকিৎসায় নজরদারি করেন এনএইচএম কর্মীরা। রাত বিরেতে খবর পেয়ে রোগীর বাড়িতে ছুটে যান তাঁরাই। সর্বোপরি বিশ্বমহামারি পরিস্থিতিতে কোভিড রোগীর নামের তালিকা প্রস্তুত, কোভিড পরীক্ষা এবং ম্যানেজমেন্টের কাজ করে চলেছেন এনএইচএম কর্মীরা। অন্যান্য সরকারী কর্মীদের মত তাঁরাও কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারি মোকাবিলায় সামনের সারির যোদ্ধা হিসাবে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে অতি সামান্য বেতনে ঠিকায় নিযুক্ত এনএইচএম কর্মীরা তাঁদের স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন।

বর্তমানে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্থায়ীকরণের দাবিতে চলছে এনএইচএম কর্মীদের আন্দোলন। কর্নাটকের প্রায় ৩০,০৫৩ জন এনএইচএম কর্মী প্রশাসনের যাবতীয় হুমকি অগ্রাহ্য ক'রে গত সেপ্টেম্বরে বেতন বৃদ্ধি'র দাবিতে ধর্মঘট করেছেন। ছত্তিশগড়েও প্রায় ১৩ হাজার এনএইচএম কর্মী স্থায়ীকরণের দাবিতে ধর্মঘট করেছেন সরকারের ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের হুমকি অগ্রাহ্য করে। পাঞ্জাবে তো বিশ্ব মহামারি শুরু হওয়ার পর এনএইচএম কর্মীরা তিনমাস বেতনই পাননি। পাঞ্জাবের ৯ হাজার এনএইচএম কর্মী গত জুন মাসে দুদিনের পেন ডাউন করেছেন বকেয়া বেতনের দাবিতে। জুন মাসেই নাগাল্যান্ডের ১৮৫০ জন এনএইচএম কর্মী ধর্মঘট করেছেন স্থায়ীকরণ সহ সম পদে সমবেতন এবং সরকারী স্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মচারীদের সমান সুবিধা'র দাবিতে।" ...

" 'বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ' এমন অবস্থায় মনে করে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে সমগ্র দেশ তথা পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলা অসম্ভব। জীবাণু ঘটিত বিভিন্ন রোগ সহ অন্যান্য রোগ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শিশুর জন্মের আগে এবং পরে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে মুক্ত করা, সাপে কাটার মত ঘটনায় যাবতীয় অবৈজ্ঞানিক ধারণার বিলোপ ইত্যাদি তৃণমূল স্তরে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া অসম্ভব।

জনগণ বিজ্ঞান মনস্ক হন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। বিজ্ঞান আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হল, গ্রাম-শহরের ব্যাপক জনগণের কাছে বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

তাই, এনএইচএম সহ সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঠিকায় নিযুক্ত সকল স্বাস্থ্য কর্মীর স্থায়ীকরণ সহ সকল ন্যায্য দাবির আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানায় বিজ্ঞান মনস্ক। বিজ্ঞান মনস্ক বরাবরই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার **সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের** দাবি করে আসছে। এই দাবির ভিত্তিতেই, এনএইচএম-এর পাশাপাশি পুর স্বাস্থ্য কর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঠিকাদার মারফৎ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং সম কাজে সম বেতনের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।"■

সমাজ দর্পণ ঃ

পুঁজিবাদের স্বার্থে 'হারাম' 'হালাল' হয়ে যায়

– প্রান্তিক দাস

সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP) ২০শে ডিসেম্বর যে খবর প্রচার করেছে তার মধ্যে রয়েছে আপাত কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই খবরটাও –

'আরব আমীরশাহীর সর্বোচ্চ ইসলামিক কর্তৃপক্ষ – ইউ এ ই ফতোয়া কাউন্সিল বিধান দিয়েছে যে করোনা ভ্যাকসিন এ শুয়োরের জিলেটিন (pork gelatin) থাকলেও তা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য গ্রহণযোগ্য। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শেখ আবদুল্লাহ বিন বায়াহ্ জানিয়েছেন যদি অন্য কোন বিকল্প না থাকে তাহলে করোনা ভাইরাস ভ্যাকসিনে শুয়োরের দেহাংশ ব্যবহার হলেও তা ইসলামীয় নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না, মানব শরীরকে প্রতিরক্ষার বৃহত্তর প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে।' কাউন্সিল বলেছে পর্ক জিলেটিনকে খাদ্যরূপে নয় – ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে শুয়োরের জিলেটিন সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। ল্যাটিন ভাষায় জিলেটাস এর অর্থ কঠিন বা জমাট বাঁধা। অর্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন এই প্রোটিন উপাদান প্রাণীশরীরের কোলাজেন থেকে সংগ্রহ করা হয়। শুকনো অবস্থায় এটা ভঙ্গুর কিন্তু সিক্ত অবস্থায় আঠালো। কোলাজেন কোষবর্হির্ভূত ধাত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এমন গঠনগত প্রোটিন। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এই প্রোটিনই সবচেয়ে বেশি মাত্রায় (মোট প্রোটিনের প্রায় ২৫-৩৫%) পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে সাধারণভাবে শুয়োর ও গরুর চামড়া, টেন্ডন (পেশি ও অস্থির বন্ধনী), লিগামেন্ট (অস্থি বন্ধনী), হাড় এসব জলে ফুটিয়ে জিলেটিন বার করা হয়। জিলেটিনের ব্যবহার সর্বত্র। স্যাম্পু থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত প্রসাধন সামগ্রী, কেক-আইসক্রিম, ফলের রস ঘন করতে, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, ভিটামিন বা ক্যাপসুলের উপরের খোল-ব্যবহারের শেষ নেই। শুয়োর থেকে প্রস্তুত করা জিলেটিন স্থায়িত্ব আনার জন্য (Stabilizing agent) (অর্থাৎ সংরক্ষণ ও পরিবহনের সময় যাতে এর সুরক্ষা ও কার্যকরিতা যাতে নষ্ট না হয়) টিকা বা ভ্যাকসিনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

বর্তমান আলোচনার মূল পরিপ্রেক্ষিত ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা। এক রিপোর্ট বলছে যে ২০১৮ তে ইন্দোনেশিয়ায় উলেমা কাউন্সিল – যারা কোন্ কোন্ বস্তু হালাল অর্থাৎ ইসলামী আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য তার স্বীকৃতি প্রদান করে – হাম (মিজ্লস) ও জার্মান হাম (রুবেলা) ভাইরাসের টিকাকে 'হারাম' ঘোষণা করে। কারণ ঐ একই। ধর্মীয় নেতারা বাচ্চাদের টিকাকরণ না করার জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ দেন। ফলস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ায় হাম প্রচন্ড হারে বেড়ে দুনিয়ার তৃতীয় সংক্রামিত দেশে পরিণত করে। এর পরবর্তীতে ডিক্রী জারি করে তাকে গ্রহণযোগ্য (হালাল) ঘোষণা করা হলেও সামাজিক বিধিনিষেধ রোগ প্রতিরোধে বাধার সৃষ্টি করেছে। এমন উদাহরণ বহু রয়েছে।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে এই প্রসঙ্গ কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহুদি ধর্মাবলম্বী অর্থোডক্সদের ক্ষেত্রেও সমস্যা একই। সেখানেও শুয়োরের মাংস খাওয়া বা অন্য কোনরূপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে কিছু কিছু র‍্যাবাইনিক্যাল সংগঠন (ইহুদি ধর্মীয় পন্ডিত মন্ডলী) বলছে – ইহুদি আইন অনুসারে শুয়োরের মাংস সাধারণভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মুখ দিয়ে না খেয়ে শরীরে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিলে – বিশেষতঃ যখন তা অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত – কোন সমস্যা নেই। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ আছে।

বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্নে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এর উল্লেখ করলে এক শ্রেণীর বিজ্ঞানকর্মীরা 'রাজনীতি হচ্ছে' বলে গেল গেল রব তোলেন। তাঁরা না মানতে চাইলেও বর্তমান যুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব আর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞাও পুঁজিবাদী রাজনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভ্যাকসিন নির্মাতা পুঁজিবাদী ফার্মা কোম্পানিগুলিও নিষেধাজ্ঞাকে মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করে। যেমন সুইৎজারল্যান্ডের বহুজাতিক নোভার্তিস 'দীর্ঘ বছর' চেষ্টা করে শুয়োরমুক্ত মেনিজাইটিস ভ্যাকসিন বাজারে এনেছে। সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া ভিত্তিক এ.জে. ফার্মা এই ক্ষেত্রে নিজস্ব ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু চাহিদা, দাম আর পর্ক জিলেটিন ব্যবহার না করলে অব্যবহৃত অবস্থায় কম দিন সংরক্ষিত করতে পারা – এই সমস্যার কারণে পর্ক যুক্ত ভ্যাকসিন আরো দীর্ঘ সময় ধরে চলবেই। ব্রিটিশ ইসলামিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এর ডাঃ সলমন ওয়াকার এর মত অনেকেই মনে করেন এই অবস্থা মানুষের মধ্যে এক অনাবশ্যক দোলাচল ও বিভ্রম সৃষ্টি করবে।

করোনা ভ্যাকসিনের বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় রত ফাইজার, মর্ডাণা এবং অ্যাস্ট্রোজেনেকা দাবি করেছে যে তাদের ভ্যাকসিনে 'পর্ক' সংস্রব নেই! এমন দাবি 'ধর্মবিশ্বাসে সম্মান

➔

সংগঠন সংবাদ ঃ

করোনা আতঙ্ক দূর করতে জনসচেতনামূলক কর্মসূচী

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ ধারাবাহিকভাবে করোনা বিশ্বমহামারি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এর মোকাবিলার জন্য জনতার দাবি নানাভাবে যেমন তুলে ধরেছে তেমনই জনমানসে এ সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি এবং আতঙ্ক দূর করতে নানা কর্মসূচী নিয়েছে রাজ্য জুড়ে।

গত ২৩শে অগাস্ট ২০২০, কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে এই উদ্দেশ্যে এক শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য হাসপাতালের এবং প্রাইভেট চিকিৎসকদের কাছে রাখা সাক্ষাৎকার ভিডিও আকারে পেশ করা হয়। কর্মীদের পাঠানো অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে সভায় উপস্থিত থাকেন ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র সদস্য তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার অশেষ রায়চৌধুরী, যিনি বর্তমানে রাজ্য সরকার দ্বারা অধিগৃহীত একটি কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসক। কর্মীদের করা অসংখ্য প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার রায় চৌধুরী অসাধারণ সাবলীলভাবে তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা রাখেন। ভাইরাস কী, তার সংক্রমণ, বিশেষতঃ সার্স কোভ-২ এর সংক্রমণ কিভাবে হয়, কোথায় হয়, সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, কোন্ পরিস্থিতিতে সংক্রমণের তীব্রতা বাড়ে, সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম কী এবং কখন কীভাবে তা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় এর এক জীবন্ত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা তিনি জনতার সামনে রাখেন। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে একটা ধারাবাহিক জীবনশৈলীর প্রশ্ন এবং কীভাবে অর্জিত হয় তার ব্যাখ্যা রাখেন। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচারকে তীব্র কটাক্ষ করে তার পিছনে ব্যবসায়িক স্বার্থকে তুলে ধরেন। অপরিকল্পিত লকডাউন করা এবং জনগণের কোন দায় দায়িত্ব না নেওয়ার জন্য সরকারকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। মাস্ক ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজেশনের বৈজ্ঞানিক দিক, তার সাইড এফেক্ট তুলে ধরেন। সবশেষে সকলের জন্য বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামের বার্তা দেন।

এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই কর্মসূচীর মুখ্য অংশ ভিডিও করে করোনা আতঙ্ক ঠেকাতে হাওড়া জেলায় ব্রজবল্লভপুর, আমতা এবং উদয়নারায়রূপ ব্লকে মোট ৭টি প্রোগ্রাম করে। পূর্ব বর্ধমান জেলার নিমতলা এবং নদীয়া জেলার নবদ্বীপেও একই কর্মসূচী রূপায়িত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা, জয়নগর ১নং ব্লক, লক্ষ্মীকান্তপুর, সোনারপুর এবং আশুতি ১ এবং ২ নং ব্লকেও এই কর্মসূচী রূপায়িত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার পোড়া অশ্বত্থতলা অঞ্চলেও একই কর্মসূচী রূপায়িত হয়।

স্থানীয় ক্লাব, স্কুল কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির সহযোগিতায় জনতার মধ্যে এই কর্মসূচীতে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ অংশ নেন এবং ভিডিও প্রদর্শন, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রাখার পর জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রশ্নোত্তরের পর্ব অনুষ্ঠানগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সমগ্র কর্মসূচী করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক ধারণা দূর করতে, অনাবশ্যক আতঙ্ক দূর করতে কিছু মাত্রায় হলেও ভূমিকা পালন করেছে বলে উপস্থিত জনতার বড় অংশ মত প্রকাশ করেছেন।■

● *পুঁজিবাদের স্বার্থে 'হারাম' 'হালাল' হয়ে যায়*

দেখানোর জন্য' – একথা মেনে নেওয়ার লোক কমই পাওয়া যাবে। যাই হোক জিলেটিন ব্যবহার করা হয় এমন দ্রব্যের তালিকা দেখলে বাস্তব সত্যটা সকলেই বুঝতে পারবেন।

মানুষ কুসংস্কারগ্রস্ত – এই সিদ্ধান্তে আসার আগে বিজ্ঞানকর্মীদের শতবার-হাজারবার প্রশ্ন করতে হবে এর উৎস কী? কারা এসব মানুষের মধ্যে প্রচার করছেন?

আজ বিপদে পড়ে সেই সব ধর্মীয় কর্তৃত্ব উদার বিধান দিচ্ছেন। করোনা অতিমারি অনেক বিশ্বাসীর মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। যে ধর্মীয় নেতারা পবিত্র বিধানের নামে এক ইঞ্চি ছাড়তে রাজি হন না তারা মাসের পর মাস দেবালয় বন্ধ রেখে, দেব-দেবীর মূর্তিতে স্যানিটাইজারে ধুয়ে 'শুদ্ধ' করছেন। এর অন্যদিক হল বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যে বর্তমান আধুনিক সমাজে প্রতিষেধকে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা খড়কুটোর মত উড়ে যাবার ভয়। এই ঘটনা থেকে কী বেরিয়ে আসে? এই সত্যই বেরিয়ে আসে যে **বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে ধর্মবাদী-উলেমা-মহন্তরা চলেন পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে।** জনমানসে ধর্মীয় কুসংস্কার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অথবা পুঁজির স্বার্থে হোক – হারাম হালাল হয়ে যায়, হালাল হারাম।■

মনরেগা প্রকল্পে মাটি কাটতে গিয়ে শ্রমিকরা মাটি চাপা পড়লেন

পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর ব্লকের নিমতলা অঞ্চল। এলাকার অসংখ্য শ্রমজীবীদের খুব অল্প সংখ্যকই কৃষি কাজে যুক্ত। অধিকাংশ শ্রমজীবীরাই তাঁত শিল্পের (হ্যান্ডলুম এবং পাওয়ারলুম) কাজে যুক্ত। এলাকার একটা বড় অংশের শ্রমজীবী দেশে এবং দেশের বাইরে শ্রমের কাজে যান। মহামারি পরিস্থিতিতে এবং আচমকা লকডাউনের ফলে বহু মানুষ গ্রামে ফিরে এসে কর্মহীন। এই অবস্থায় এলাকায় বহুদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বা এমএনজিআরএ প্রকল্পে কাজের দাবি রয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে এই ব্লকে এই প্রকল্পে মাত্র ৫ শতাংশ কাজ হয়েছে। তাই উৎসবের মরশুমে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কাজে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বজনপোষণের অভিযোগ আছে। দেখা গেছে একজন সুপারভাইজার দুটি কাজ একসাথে করছেন অথচ কর্মহীন মানুষের সংখ্যা অগুনতি।

গত ১১ই নভেম্বর খালের ধারে ২৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সেখানে ছিল একটা ১২-১৩ ফুট উঁচু মাটির স্তূপ। দীর্ঘদিন এই স্তূপ পড়ে থাকায় সেখানে উইপোকার বাসা হয়েছিল। স্তূপের মধ্যে অসংখ্য গর্ত ছিল এবং মাটি ছিল ঝুরঝুরে। ঐ শ্রমিকদের ওই স্তূপের পাশে মাটি কাটতে বলা হয় এবং বলা হয় গর্তের নিচ থেকে তা কাটতে হবে। প্রচন্ড অবৈজ্ঞানিকভাবে চলতে থাকে মাটি কাটার কাজ।

গত ১১ই নভেম্বর বেলা ১১টায় প্রায় সুরঙ্গ তৈরি হওয়া গর্তে সুপারভাইজার ঐ ২৫ জন শ্রমিকের হাজিরা করান। তারপর সুপারভাইজার তার অন্য প্রকল্প পরিদর্শনে চলে যান। ৫ জন ছাড়া বাকি শ্রমিকরাও তাদের কাজে চলে যান। ৫ জন (৩ জন মহিলা ২ জন পুরুষ) শ্রমিক ওই গর্তের মধ্যে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করতে থাকেন। হঠাৎ করে স্তূপের মাটিতে ধ্বস নামে। ধ্বসে চাপা পড়েন ৫ জন শ্রমিক। বাকি শ্রমিকরা লক্ষ্য করেন ৫ জন শ্রমিককে দেখা যাচ্ছে না। তারা ওই স্থানে ছুটে এসে বুঝতে পারেন শ্রমিকরা মাটি চাপা পড়েছেন। তখন ওই শ্রমিকরা হাক-ডাক করে অন্যদের ডেকে এনে আহত ৫ জন শ্রমিককে উদ্ধার করেন। উদ্ধারের পর শ্রমিকদের কালনা হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় লোকজন প্রশ্ন করেন সুপার ভাইজার কোথায়? শোনা যায় যে সে অন্য প্রকল্পের কাজ দেখাশোনায় গেছেন। পরবর্তী খবর, ওই ৫ জন শ্রমিককে কালনা হাসপাতাল থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

এই ঘটনা জেনে স্থানীয় 'বিজ্ঞান মনস্ক' সংগঠনের প্রতিনিধিরা বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান শুরু করেন। বাড়ির লোকের কাছ থেকে জানা যায় যে ২ জন মহিলা শ্রমিকের পা ভেঙে যায়, অন্যরাও দুর্ঘটনায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এরপর কার্যত নিজস্ব খরচায় এদের চিকিৎসা করতে হয়েছে। প্রশাসন বাস্তবত কোন দায়িত্ব নেয় নি। এই নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানের সময় এলাকার শ্রমিকরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পঞ্চায়েত থেকে ঐ ৫ জন শ্রমিককে ৪০ কেজি করে চাল এবং হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটি কাটার কাজে আহতদের পরিবারের লোকেদের স্থায়ী কাজ এবং পূর্ণ ক্ষতিপূরণের দাবি তুলে ধরেছে। আহতদের চিকিৎসাসহ সকল দায় নেওয়ার দাবি জানিয়েছে এবং গ্রামের সকল বেকারদের সারাবছর কাজ দিতে হবে, নইলে ন্যূনতম মজুরি ভাতা হিসেবে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। আহতদের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। এলাকায় পোস্টারিং এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ায় শ্রমজীবী জনতার বড় অংশ বলেছেন 'এর আগে আমাদের কথা কেউ তুলে ধরেনি, আমাদের কথা ভাবে নি। তবে দাবি আদায় করতে হলে সংগঠন গড়তে হবে।' আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয় 'আপনারা অধিকার আদায়ের জন্য নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব।'■

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মসূচী

নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য-পরিষেবার অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি এখন কার্যতঃ নিয়মে পরিণত হয়েছে। মহামারিকালে দেশে নতুন করে প্রায় চার কোটি মানুষ বেকার হয়েছেন, অধিকাংশ মানুষের রোজগার প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি প্রায় অসহনীয়। বিজ্ঞান মনস্ক সঠিক বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় মানুষের কাছে সমস্যা সমাধানের আশু দাবিগুলি চিহ্নিত করে প্রচারে নেমেছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই প্রচার পত্রের মূল অংশ তুলে ধরা হল। – সম্পাদক, সমীক্ষণ

"... করোনা সংক্রমণের অনেক আগে থেকেই, বিগত কয়েক বছরে আলু, পেঁয়াজ, শাক-সব্জী, ডাল, ভোজ্য তেল, ডিম, দুধ, মাছ, মাংসের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। রান্নার গ্যাসসহ অন্যান্য জ্বালানি হয়েছে অগ্নিমূল্য। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহনের খরচ বেড়েছে অস্বাভাবিক। কিন্তু কেন?

অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণভাবে মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত বাজার অর্থনীতিতে যে কোন পণ্যের দাম ঠিক হয় বাজারে

পণ্যের যোগান ও চাহিদার নিয়মে। যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে জিনিষের দাম বাড়ে আর চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হলে দাম কমে। এখানে চাহিদা বলতে মানুষের প্রকৃত চাহিদা বোঝান হয় না, ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে চাহিদা বোঝায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে রোজগার কমে যাওয়ায় শ্রমজীবী জনতার অধিকাংশই জিনিষ কেনার ক্ষেত্রে বাজেট কাটছাঁট করছেন। ফলে বাজারে মাল বিক্রি কমে গেছে। পুষ্টি বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে খাদ্য খাওয়ার কথা এখন অবান্তর। বাজারে মালের চাহিদা এত কমে যাওয়া সত্ত্বেও তবে কেন জিনিষের এত দাম বাড়ছে?

আসুন, সমস্যার আর একটু গভীরে যাই। গতবছর এদেশে রেকর্ড আলু উৎপাদন হলেও আলুর দাম দ্বিগুণ হয়েছে। গত বছর দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন দেশের মোট চাহিদার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও দাম হয়েছে দ্বিগুণের বেশি। ডাল উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করেও দেশে সব ধরনের ডালের গড় দাম বেড়েছে প্রায় ৪১ শতাংশ। সবরকম শাকসব্জী চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি হলেও বছরের বেশি সময় তা অগ্নিমূল্য। মাছ, মাংস, ডিম উৎপাদন যথেষ্ট হলেও তার দাম বাড়ছে। দুধ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম হলেও তার দাম বাড়ছে। একমাত্র ভোজ্য তেল উৎপাদনে ভারত দেশের চাহিদার তুলনায় পিছিয়ে। গত ৫ বছরে ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ১১-২০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় সমস্ত কৃষিজ পণ্যই অঢেল উৎপাদন হলেও তার বাজার দর আকাশ ছোঁয়া। কিন্তু অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষ লাভজনক তো নয়ই, পরিশ্রমের মূল্যটুকুও পাচ্ছেন না। তাহলে এমন হচ্ছে কেন?

কারণ মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত বাজার অর্থনীতি, যাকে বলা হয় পুঁজিবাদ তা প্রায় শতাধিক বছর ধরে একচেটিয়ারূপ ধারণ করে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। শিল্প, কৃষি সহ সকল পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা এখন বৃহৎ-অতিবৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর চক্রের (কার্টেল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ছোট-বড় কার্টেলগুলি তাদের মুনাফা-অতিমুনাফার স্বার্থে দেশে বিদেশে শিল্প-কৃষিসহ সকল পণ্যের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনমত পণ্য মজুত করে। এটাই পণ্যের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ।

এই কার্টেলগুলির দ্বারা খাদ্যপণ্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের মজুতদারির বিরুদ্ধে মাঝে-মধ্যে তর্জন-গর্জন করা ছাড়া সরকারের কোন ভূমিকা নেই। উল্টে সম্প্রতি 'দ্য এসেনশিয়াল কমোডিটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল সংসদে পাশ হওয়ায় চাল-আটা-ডাল-আলু-পেঁয়াজ, ভোজ্য তেলসহ ২৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খাদ্যপণ্য মজুত করার ঊর্ধ্বসীমাও তুলে দেওয়া হয়েছে। সদ্য সংসদে পাশ হওয়া 'দ্য ফার্মার্স এগ্রিমেন্ট অফ প্রাইস অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিস' আইনে আগে থেকে চালু হওয়া চুক্তি চাষকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে বৃহৎ-অতিবৃহৎ কোম্পানির স্বার্থে। এর ফলে শুধু মজুত নয়, প্রয়োজন অনুসারে তারা উৎপাদনকেও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে এবং বাজারে পণ্যের যোগানকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করে দাম বাড়িয়ে যেতে পারবে। এই কৃষি আইনগুলির বিরুদ্ধে দেশের কয়েকটি রাজ্যের ফার্মাররা এখন আন্দোলনের ময়দানে। তাদের প্রধান দাবি হল লাভজনক দামে সকল কৃষিপণ্য সরকারকে কিনতে হবে। এই আন্দোলনকে তাই সকল প্রগতিশীল জনতা সমর্থন করেন।

অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্যে 'সুফল বাংলা' এবং অন্য রাজ্যে অন্য নামে সরকারি স্টল থেকে স্বল্পমূল্যে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি বিক্রির বন্দোবস্ত যথেষ্ট নয়, তা পরিস্থিতির বিচারে মরুভূমিতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির মত।

খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন নামক পরিষেবাও এই ব্যবস্থায় পণ্য। পয়সা থাকলেই তা কেনা যায়, নতুবা নয়। পরিবহন ক্ষেত্রেও (রেল-বাস-বিমান) শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মত আমরা দেখছি বেসরকারিকরণ করাই এখন প্রধান প্রবণতা। মানুষের প্রয়োজনে পরিষেবা দান নয়, সংস্থাগুলির লাভ-লোকসানের হিসাবেই তা পরিচালিত হয়। দেশী-বিদেশী হাঙরেরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন ব্যবসায় বিপুল মুনাফা কামাচ্ছে। তাই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহনের দামও বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সরকার/মন্ত্রীকে দায়ী করে সরকার পরিবর্তনের দাবি ওঠে। কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ জানেন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রেখে সরকার/মন্ত্রী পরিবর্তন করে কোন ফল হয় না। এই ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ জিনিষপত্রের দাম বাড়াটাই মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ম। দীর্ঘ ৭০ বছরের ইতিহাসে ভারতীয় জনগণ মরমে মরমে এই সত্য উপলব্ধি করছেন।

তাহলে সমস্যা সমাধানের আশু উপায় কী? আমাদের কৃষিপণ্যসহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও তার বাজার নিয়ন্ত্রণ একচেটিয়া কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়ার বিপরীতে সরকারকে তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি –

*** কৃষিপণ্যসহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির দায় সরকারকে নিতে হবে।**

*** কৃষকদের থেকে লাভজনক মূল্যে সকল প্রকার ফসল কিনে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।**

*** শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ করে জনস্বার্থে তা পরিচালিত করতে হবে। ..."**■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com